USAID | PRICE

আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

POVERTY REDUCTION BY INCREASING THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES

মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ সহায়িকা

মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ সহায়িকা-৬

বিলে মাছচাষ ব্যবস্থাপনা

(Beel Aquaculture Management)

Prepared by:
PRICE-USAID

বিলের বৈশিষ্ট্য ও বিল ব্যবস্থাপনা

বিল ও বিলে মাছচাষ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সাধারণ ধারণা

আবহমান কাল হতে এদেশের খাদ্য তালিকায় প্রাণীজ আমিষের প্রধান উৎস হিসেবে মাছ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। এদেশে রয়েছে অনেক মাছ চাষোপযোগী ও ব্যবস্থাপনাযোগ্য উন্মুক্ত ও বদ্ধ জলাশয়। প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট নানাবিধ কারণে সেগুলো ভরাট হয়ে মাছের আবাসস্থল নষ্ট হওয়ায় মাছের বংশ বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটছে। ফলে, দিন দিন উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদন কমে আসছে। বাংলাদেশের মোট মাছ উৎপাদনের প্রায় ৪২% আসে স্বাদু পানির উন্মুক্ত জলাশয় হতে এবং এ উৎপাদনের বিরাট অংশ আসে বিল ও প্লাবনভূমি থেকে। প্লাবনভূমি বিলেরই অংশ। বাংলাদেশে প্রায় ছোট বড় অসংখ্য বিল রয়েছে। নানাবিধ প্রতিকূল পরিবেশের জন্য এসব বিলেও মাছের প্রজননসহ উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে।

বিল ও বিলের বৈশিষ্ট্য

বিল বলতে এমন কোন প্রাকৃতিক মুক্ত জলাশয়কে বুঝায় যা সাধারণত বন্যায় প্লাবিত হয় এবং যার সাথে কোন নদীর সংযোগ থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। অনেক সময় একাধিক বিল একসাথে একত্রিত হয়ে বড় প্রাকৃতিক জলাশয়ের সৃষ্টি হয় যা হাওর নামে পরিচিত। বিভিন্ন বিলের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। বিলের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো ঃ

- বিল অভ্যন্তরীণ প্রাকৃতিক মুক্ত জলাশয়।
- সাধারণতঃ বন্যায় প্লাবিত হয়।
- নদী বা খালের সাথে সংযোগ থাকে আবার সংযোগ থাকেও না।
- বিলের কোন পাড় থাকে না।
- বিলের কোন অংশে সারা বছর পানি থাকে আবার কখনও শুকিয়েও যায়।

- বিলের বিরাট ক্যাচমেন্ট এরিয়া (Catchment area) থাকে।
- বিলের বিরাট অংশে শুষ্ক মৌসুমে ধান চাষ হয়। এ অংশ বর্ষাকালে প□াবিত হয়ে প□াবনভূমি নাম ধারণ করে।
- বিলের পানি নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।
- প্রচুর নিমজ্জিত ও ভাসমান জলজ উদ্ভিদ ও আগাছা থাকে।
- বিলে নানা প্রজাতির মাছ, জলজ প্রাণী ও অন্যন্যা প্রাণীর বাস ।

বিলের পরিবেশ

আমাদের চারিপাশের সবকিছু নিয়েই পরিবেশ। সুস্থ পরিবেশ মানেই সুস্থ মানুষ। অনুরূপভাবে মাছের পরিবেশ বলতে বুঝায়- যে পুকুর, নদী খাল বা বিলে তাদের বাস তার সার্বিক অবস্থা। ভাল পরিবেশ মানেই সুস্থ মাছ আর অধিক ফলন। অধিক ফলন মানেই অধিক লাভ। মাটি ও পানি নিয়েই বিলের পরিবেশ। বিলের মাটি ও পানির বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ঃ

- **বিলের মাটি** সাধারণত কাদা (এঁটেল) দো-আঁশ।
- **পানি** সাধারণত পরিস্কার, তবে বেশি বর্ষায় তীরবর্তী অংশের পানি অনেক সময় ঘোলা হয়।
- **বিলে** প□াংকটনের স্বল্পতা থাকে।
- বিলে ছোট বড় নানা প্রজাতির মাছ, চিংড়ি, সাপ, ব্যাঙ, কাকড়া, শামুক, পোকা-মাকড়ের বসবাস।
- **বিভিন্ন ছোট বড় উদ্ভিদ ও আগাছা যেমনঃ হিজল,** কলমী হেলেঞ্চ, মালঞ্চ, কচুরীপানা, টোপাপানা, ক্ষুদি পানা, শাপলা, শালুক, ঝাঁঝি, আড়াইল, পাটলী, কাটালী ইত্যদি থাকে।

বিলের মৎস্য প্রজাতি

সাধারণতঃ বাংলাদেশের বিলগুলো জীববৈচিত্রে খুবই উন্নত ছিল। বিভিন্ন ধরনের মাছ, জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ দ্বারা বিলগুলো পরিপূর্ণ থাকতো। বিলগুলো নানাবিধ সুস্বাদু মাছের ভান্ডার হিসেবে পরিচিত ছিল। বিলগুলোতে প্রাকৃতিকভাবে যে সমস্ড় মাছ পাওয়া যায় তা কয়েকটির নাম নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

বিলের কয়েকটি গুর“ত্বপূণ মাছের তালিকা

র“ই	ফলি		কৈ
কাতলা	আইড়		খলিসা
মৃগেল	গুচি আইড়		টেংরা

কালবাউস	শিং		পুটি
ভাংনা	মাগুর		চাপিলা
গনিয়া	পাবদা		চান্দা
শোল	মলা		চেলা
গজার	ঢেলা		রানী
টাকি	বাইচা		ভেদা বা মেনি
বোয়াল	দারকিনা		গুতুম
চিতল	চেলা		বাইম

বিলে মাছ চাষ ও ব্যবস্থাপনা

প্রাচীনকাল হতে বাংলাদেশের বিলসমূহ হতে শুধুমাত্র মাছ আহরণ করা হতো। এ সম্পদের যে সীমাবদ্ধতা রয়েছে তা কখনও চিন্ড়া করা হতো না। ফলে, অপরিকল্পিতভাবে মাছ আহরণে দিন দিন বিলে মাছের প্রাপ্যতা হ্রাস পাচ্ছে এবং সার্বিকভাবে বিলের উৎপাদন কমে যাচ্ছে। বর্তমানে এ সম্পদ উন্নয়নের প্রচেষ্টা চলছে এবং ধীরে ধীরে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিলে মাছচাষ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য নিম্নোক্ত কার্যাবলীসমূহ বাস্ড়বায়নের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

- সমবায় ভিত্তিক উদ্যোগ বা সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা।
- বিলের পরিবেশ জানা এবং জমির মালিকানা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া।
- বিলে অবস্থিত মাছের প্রজাতি সনাক্তকরণ।
- বিলের মাছ বাহিরে চলে যাওয়া রোধকরণ।
- বিলে পোনা মাছ মজুদের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পোনা মাছ মজুদের নিমিত্ত নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা ঃ
    - বিল নার্সারি স্থাপনের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন ও অবমুক্ত করার ব্যবস্থা করা।
    - মুজতব্য মাছের প্রজাতি. আকার, সংখ্যা এবং অনুপাত নির্ধারণ।
    - মাছের উৎস জেনে মাছের পোনা সংগ্রহের ব্যবস্থা নেওয়া।
    - সুস্থ সবল পোনা মাছ সনাক্তকরণ।
    - পোনা মাছ টেকসই করণ ও মজুদকরন।
- মাছ চুরি রোধ করণ।
- বিলের আগাছা ব্যবহার করে কম্পোস্ট তৈরির মাধ্যমে মাছের খাদ্যের যোগান।
- মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষণ ও দেহের বৃদ্ধি পরিমাপ করা।
- মাছ আহরণ।

- মাছ বাজারজাতকরণ।
- তথ্য সংরক্ষন।
- লাভ লোকসানের হিসাব।

বর্তমান বিল ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের পন্থা

দীর্ঘদিন যাবৎ ইজারা প্রথার মাধ্যমে বিল ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করা হয় বিধায় বিল হতে শুধুমাত্র সর্বোচ্চ মাত্রায় মাছ আহরণ করা হয়। বিলের উৎপাদন বৃদ্ধির কথা সাধারণতঃ কেউ চিন্ড়াও করে না। বিলের এ ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ ক্রটিপূর্ণ। এ ব্যবস্থাপনায় বিলে মাছের প্রাপ্যতা দিন দিন কমে যাচ্ছে এবং এমন একসময় হয়তো আসবে যখন উৎপাদন শূন্যের কোটায় চলে যাবে। বিলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে এর জৈবিক ব্যবস্থাপনার সূচনা করতে হবে। বিলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে সার্বিকভাবে বিলের স্থায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের পরিকল্পনা করতে হবে। বিলের ব্যবস্থাপনা বিভিন্ন পদ্ধতিতে হতে পারে। বিলকে যারা ব্যবহার করে বা বিল হতে যারা সূফল গ্রহণ করে (প্রধানতঃ কৃষক ও মৎস্যজীবী) তাদের উদ্বূদ্ধ করে বিলের সুফলভোগীদের সংগঠন গঠনের মাধ্যমে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও বিলের উন্নয়নে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। বিলের জৈবিক ব্যবস্থার উন্নয়ন না করলে স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন ঘটবে না। বিলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রধানতঃ প্রয়োজন মাছের আবাসস্থল পুনরূদ্ধার ও উন্নয়ন, অভয়াশ্রম স্থাপন ও সংরক্ষণ, বিলে দেশীয় প্রজাতির পোনা অবমুক্তি বা বিল নার্সারি স্থাপনের মাধ্যমে বিলে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের মজুদ বৃদ্ধি এবং বিলের জীববৈচিত্র রক্ষার নিমিত্ত মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্ড়বায়ন ইত্যাদি। তা'ছাড়া বিলের একক এলাকায় উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে খাঁচায় মাছচাষ ও পেনে মাছচাষ করে মৎস্যজীবীগণ বিলের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পারে।

বিলে খাঁচায় মাছচাষ

আমাদের দেশে সাম্প্রতিক সময়ে খাঁচায় মাছচাষ নতুন আঙ্গিকে শুর হলেও আন্তর্জাতিক বিশ্বে খাঁচায় মাছচাষের ইতিহাস অনেক পুরানো। আমাদের দেশেও দীর্ঘদিন যাবৎ খাঁচায় মাছচাষ করা হলেও জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে নাই। তবে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার কারণে বর্তমানে খাঁচায় মাছচাষ ক্রমাগতভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন ধরনের জলাশয়ে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ উপযোগী আকারের খাঁচা স্থাপন করে অধিক ঘনত্বে ব্যনিজ্যিকভাবে মাছ উৎপাদনের প্রযুক্তিই হলো খাঁচায় মাছচাষ। কোন উন্মুক্ত বা আবদ্ধ জলাশয়ে বাঁশের বানা বা জাল বা লোহার নেট দিয়ে বা অন্য কোন উপকরণ দিয়ে চারিদিক ঘিরে বা বেঁধে খাঁচা তৈরি করা হয়। আর খাঁচায় মাছ চাষ হলো- জাল এবং বাঁশ দিয়ে অথবা লোহার ফ্রেমে জাল লাগিয়ে তৈরি খাঁচায় মাছ পালন। খাঁচায় মাছচাষের ক্ষেত্রে স্রোতশীল নদীতে খাঁচা স্থাপন করা শ্রেয়। বিলে সমাজভিত্তিকভাবে খাঁচায় মাছচাষ করলে খাঁচা রক্ষণাবেক্ষণ করা সহজ।

খাঁচায় মাছ চাষের সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা

- বদ্ধ ও চলমান সব পানিতে খাঁচা স্থাপন করা যায়, তবে বদ্ধ পানিতে খাঁচার ঘনত্ব কম খাকতে হবে।
- বদ্ধ জলাশয়ে খাঁচার উচ্ছিষ্ট খাবার অন্য মাছের কাজে লাগে।
- যৌথমালিকানাধীন জলাশয়ে বা বিলে খাঁচা ব্যবহার করা যায়।
- স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করা যায়।
- নারী ও শিশুদের একাজে সম্পৃক্ত করা যায়।
- খাঁচা হতে মাছ আহরণ সহজ, এমনকি তাৎক্ষণিক পারিবারিক প্রয়োজনে সহজেই মাছ ধরা যায়।

অসুবিধা

- প্রয়োজনীয় সুষম সম্পুরক খাদ্য ছাড়া উৎপাদন ভাল হবে না।
- কাঁকড়া খাঁচা কেটে দিতে পারে ফলে মাছ খাঁচা থেকে বের হয়ে যেতে পারে।
- শত্রতা বশতঃ জাল কেটে মাছ বের করে দিতে পারে বা মাছ চুরি হতে পারে।

- খাঁচা চুরির সম্ভাবনা থাকে।
- প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ড়হতে পারে।
- খাঁচার উপকরণ সহজেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
- বিলে একই জায়গায় দীর্ঘদিন খাঁচায় মাছ চাষ করলে পানি দূষিত হতে পারে এবং জলাশয় ভরাট হয়ে যেতে পারে।

খাঁচা তৈরির উপকরণ

খাঁচা তৈরি করতে নানা প্রকার উপকরণের প্রয়োজন হয়। ব্যবহারের ভিত্তিতে খাঁচার উপকরণগুলোকে তিনভাগে ভাগ করা যায়।

- খাঁচার জাল তৈরির উপকরণ।
- খাঁচার ফ্রেম তৈরির উপকরণ।
- খাঁচা পরিচালনার জন্য উপকরণ।

১. খাঁচার জাল তৈরির উপকরণ

- পলিইথিলিন জাল (৬ তার বিশিস্ট ঘের জাল)।
- নেট (খাদ্য আটকানোর বেড় তৈরির জন্য)।
- কাছি বা দড়ি (২৪ তার বিশিষ্ট)।
- গ্রীন হেংস চিকন রশি (২৪ তার বিশিষ্ট)।
- গ্রীন হেংস চিকন সুতা (মেরামতের জন্য)।
- খাঁচার কভার নেট বা ঢাকনা জাল (পাখি ইত্যাদির উপদ্রব থেকে রক্ষার জন্য)।
- খাঁচাকে পানিতে ঝুলন্ড় রাখার জন্য প্রতি্টি খাঁচার নিচে বাঁধার জন্য ইট বা সিমেন্টের ব□ক।

২. খাঁচার ফ্রেম তৈরির উপকরণ

- ১” জিআই পাইপ (৭০ ফুট প্রতিটি খাঁচার জন্য)।
- ঝালাই করার জন্য ওয়েলডিং রড ও ফ্লাটবার।
- ফ্রেম ভাসমান রাখার জন্য খালি ব্যারেল বা ড্রাম (২০০ লিটারের পিভিসি ড্রাম)।
- খাঁচা স্থির রাখার জন্য নোঙ্গর (Anchor)|

- ফ্রেমের সাথে বাঁধার জন্য মাঝারি আকারের সোজা বাঁশ।

১. খাঁচা পরিচালনার জন্য উপকরণ

- খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্যাদি রাখার জন্য ছোট টিনশেড ঘর।
- খাদ্য প্রদান ও নিয়মিত পরিচর্যার জন্য ছোট নৌকা।
- মাছ বাছাই ও স্থানান্ড়রের জন্য সুবিধাজনক পাত্র।
- মাছ আহরণের জন্য ঝুড়ি বা খাড়ি।
- মাছ ওজনের জন্য ছোট বড় বিভিন্ন আকারের ব্যালেন্স বা দাড়ি পাল□া।

খাঁচার আকার

খাঁচার আকার নির্ভর করে জলাশয়ের প্রকৃতি ও তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর। স্রোতশীল নদীতে খাঁচার আকৃতি বড় হলেও অসুবিধা নেই। কিন্তু বদ্ধ জলাশয়সমূহে খাঁচা স্থাপন করতে হলে খাঁচার আকৃতি তুলনামূলকভাবে ছোট হবে। খাঁচার আকার আয়তকার বা বর্গাকার হতে পারে। ছোট খাঁচার চেয়ে বড় আকারের খাঁচায় মাছের বৃদ্ধি হার তুলনামূলকভাবে বেশি। আবার খাঁচার আকৃতি খুব বড় হলেও ব্যবস্থাপনায় অসুবিধা হয়। উন্মুক্ত স্রোতশীল নদীর জন্য ৩-৫ ঘন মিটার খাঁচা ব্যবস্থাপনার জন্য ভাল। তবে বদ্ধ জলাশয়ের জন্য ছোট খাঁচাই উত্তম। এক্ষেত্রে ১ ঘনমিটার ফ্রেম তৈরি করে উপযোগী জাল দ্বারা আবৃত করে খাঁচা তৈরি করা যায় এবং স্বল্প মূল্যের ফ্লোট কিংবা খালি পানির কনটেইনার দ্বারা খাঁচাকে প্রত্যাশিত গভীরতায় ভাসমান রাখা যায়।

খাঁচা স্থাপনের স্থান নির্বাচন

খাঁচা স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচন বিষয় গুর ত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে। প্রথমতঃ জলাশয়ে প্রকৃতি দ্বিতীয়তঃ পরিবেশগত প্রভাব। জলাশয়ের প্রকৃতির মধ্যে প্রধান তিনটি নিয়ামক- পানির গুণাগুণ, পানির গভীবতা ও পানির প্রবাহমাত্রাকে গুর ত্ব দিয়ে খাঁচা স্থাপন করতে হবে।

জলাশয়ের যেখানে খাঁচায় স্থাপন করা হবে সে জায়গাটি ৩-৪ মিটার গভীরতা হলো ভাল। কম গভীরতায় খাঁচা স্থাপন করা সমীচীন নয়। বদ্ধ জলাশয়ে যেহেতু পানি পরিবর্তিত হয় না ফলে তলদেশের কাদা ও খাঁচা থেকে আসা মাছের বর্জ্য পদার্থ মাছ ও পরিবেশকে প্রভাবিত করে। তাই খাঁচা যত উপরের দিকে থাকবে ততই মাছের জন্য উপযোগী। স্বাভাবিক পরিবেশে বদ্ধ জলাশয়ে খাঁচা স্থাপন করলে জলাশয়ের তলদেশ থেকে খাঁচার তলদেশের মাঝে নুন্যতম ১

মিটার দূরত্ব নিশ্চিত করা উচিত। বদ্ধ জলাশয়ের চেয়ে প্রবাহমান পানিতে খাঁচা স্থাপন করে মাছচাষ করলে পরিবেশ দূষণ হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। খাঁচা স্থাপনে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় আনতে হবে ঃ

- জলাশয়ে খাঁচার অবস্থান (গভীরতা, জলাশয়ের স্থান)।
- খাঁচা স্থাপন পদ্ধতি (একক বা সারিবদ্ধ)।
- খাঁচা হতে খাঁচার দুরত্ব (কমপক্ষে ১ মিটার)।
- খাঁচা স্থাপনের সময় (পোনা মজুদের কমপক্ষে ১০-১৫দিন পূর্বে)।
- কাঁকড়ার নাগালের বাইরে রাখা (খুঁটির গোড়ায় ব্যবহৃত পানির বোতলের ফানেল অথবা পাটের দরি পেঁচিয়ে দেয়া।
- পানির উপরে খাঁচার উচ্চতা (২০-৩০ সেমি)।
- ফ্লোট বাঁধা (পানির ২০ সেমি. নিচে)।

খাঁচায় চাষ উপযোগী মৎস্য প্রজাতি

খাঁচায় মাছচাষ স্বাভাবিক জলাশয়ে বা পুকুরে মাছচাষের চেয়ে বৈচিত্রপূর্ণ। খাঁচায় পুকুরের চেয়ে অনেক বেশি ঘনত্বে পোনা মজুদ করা হয়। খাঁচার মাছ শুধুমাত্র সম্পুলক খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল। খাঁচায় চাষের জন্য মাছের পীড়ন সহ্য ক্ষমতা না থাকলে মাছ মারা যেতে পারে। সাধারনভাবে খাঁচায় চাষের জন্য মাছের প্রজাতিগুলোর নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করা হয় ঃ

- যে সমস্ড় মাছের দৈহিক বৃদ্ধির হার বেশি।
- অধিক ঘনত্বে বসবাস উপযোগী।
- যে সমস্ড় মাছের পোনা সহজলভ্য।
- যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি।
- সম্পুরক খাদ্যে সাড়া দেয়ার প্রবণতা বেশি।
- নদীর প্রবাহমান পানির খাঁচায় লাফানোর প্রবণতা কম।
- তুলনামূলকভাবে দৈহিক পীড়ন সহ্য করার ক্ষমতা বেশি।
- স্থানীয় বাজারে ও আন্ড়র্জাতিক বাজারে চাহিদা ও মূল্য বেশি।

বর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলো বিবেচনা করে এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশে খাঁচয় চাষের প্রজাতি হিসেবে তেলাপিয়া, পাঙ্গাস, কৈ, শিং, মাগুর, গ্রাস কার্প, কমন কার্প, শোল, সরপুটি, মার্বেল গোবী, গোরামী ইত্যাদি মাছগুলোকে নির্বাচন করে থাকে। বাংলাদেশের মনোসেক্স তেলাপিয়া, থাই সরপুটি, গ্রাস কার্প, থাই কই, শিং ও মাগুর মাছকে খাঁচায় চাষের জন্য প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে। খাঁচায় মাছচাষ করতে হলে একটু বড় আকারের পোনা মজুদ করতে হয়। উন্মুক্ত জলাশয়ে খাঁচায় মাছচাষের জন্য মনোসেক্স তেলাপিয়ার চাষই উত্তম। তাতে করে জলাশয়ে তেলাপিয়ার ডিম বা পোনা যোগ হওয়ার কোন সম্ভাবনা কম। তবে জীববৈচিত্রের দিক বিবেচনায় বদ্ধ জলাশয়ে খাঁচায় তেলাপিয়া চাষ না করাই শ্রেয়।

খাঁচায় মাছের মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণ

খাঁচায় মাছ চাষের ক্ষেত্রে পোনার মজুদ ঘনত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্বল্প আয়তনে প্রত্যাশিত উৎপাদন পেতে হলে মজুদ ঘনত্ব যত বাড়ানো যায় ততই ভাল। তবে এ ঘনত্ব বাড়ানোর সাথে বেশ কিছু নিয়ামক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যে নিয়ামকগুলো পোনার ঘনত্বের ওপর প্রভাব বিস্তার করে মাছের দেহের বৃদ্ধি হারকে প্রভাবিত করে সেগুলো নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ

- পানির স্রোত।
- খাঁচার জালের ফাঁসের আকার।
- পানির গভীরতা।
- প্রত্যাশিত আকারের মাছ উৎপাদন।
- খাদ্যের গুণগতমান।
- বিনিয়োগ ক্ষমতা।
- জলাশয়ে বিভিন্ন প্রজাতির মজুদ ঘনত্ব।

বিল, হাওর ও বাঁওড় ইত্যাদি জলাশয় যেখানে স্রোত থাকে না সে সব জলাশয়ে নিম্নলিখিত ছক অনুযায়ী মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণ করা প্রয়োজন। খাঁচায় পোনা মজুদের নিমিত্ত সব সময়ই বড় আকারের পোনা মজুদ করা উচিত। রুইজাতীয় ও মনোসেক্স তেলাপিয়া ৭-১০ সেমি. আকারের পোনা মজুদ করা উচিত।

অন্যান্য মাছের তুলনায় খাঁচায় মনোসেক্স তেলাপিয়ার চাষ বেশি উপযোগী। মজুদ ঘনত্ব নির্ভর করে জলাশয়ের প্রকৃতি ও জলাশয়ের খাঁচার ঘনত্বের ওপর ও খাদ্য ব্যবস্থাপনার ওপর্ এবং প্রত্যাশিত মাছের ওজনের ওপর। যদি ভাসমান

উন্নত মানের খাবার প্রযোগ করা যায় তবে বেশি ঘনত্বে পোনা ছাড়া যেতে পারে। বদ্ধ জলাশয়ে খাঁচায় মনোসেক্স তেলাপিয়ার সাধারণ মজুদ ঘনত্ব ৪০-৫০ টি/ঘন মিটার।

বদ্ধ জলাশয়ে খাঁচায় বিভিন্ন একক প্রজাতির চাষের জন্য মজুদ ঘনত্ব

মাছের প্রজাতি	প্রতি ২০০ বর্গফুট আকারের খাঁচায় মজুদ ঘনত্ব (সংখ্যা)
মনোসেক্স তেলাপিয়া	৬০০-৭০০
সরপুটি	৬০০-৭০০
পাঙ্গাস	৪০০-৫০০
কার্পিও	৩০০-৪০০
গ্রাস কার্প	৩০০-৪০০
কালি বাউশ	৩০০-৪০০
কৈ	৪০০-৫০০
শিং	৪০০-৫০০
মাগুর	৪০০-৫০০

খাঁচায় খাদ্য প্রয়োগ ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা

খাঁচায় মাছচাষ ক্ষেত্রে অবশ্যই সুষম সম্পুরক খাদ্য প্রয়োগ অত্যাবশ্যক। মাছের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য বাহির থেকে পরিমিত মাত্রায় প্রয়োজনীয় সকল পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ যে সমস্ড় খাদ্য সরবরাহ করা হয় তাকেই সুষম সম্পুরক খাদ্য বলা হয়। বানিজ্যিকভাবে লাভজনক উপায়ে খাঁচায় মাছ চাষে সম্পুরক খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

মাছের পুষ্টি চাহিদা

মাছের দেহ বৃদ্ধির জন্য আমিষের ভুমিকা অত্যন্ড় গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্য উপকরণের অন্যতম পুষ্টি উপাদান হলো আমিষ। মাছের খাদ্যে আমিষের পাশাপাশি পরিমাণমত শর্করা, চর্বি, ভিটামিন ও খনিজ লবণজাতীয় পুষ্টি উপাদান পরিমাণ মত অবশ্যই থাকতে হবে। খাদ্যে আমিষের পরিমাণ চাষকৃত প্রজাতির আমিষ চাহিদা অনুযায়ী হতে হবে। খাদ্যের মান সঠিক না হলে মাছের ভাল উৎপাদন হবে না। খাঁচায় মাছ চাষে ৩০-৩৫% আমিষ সমৃদ্ধ খাবার প্রয়োজন। এই আমিষ মাত্রার খাদ্য হাতে তৈরি করেও খাঁচায় প্রয়োগ করা যেতে পারে।

খাঁচায় ব্যবহার উপযোগী সম্পুরক খাদ্য

সুষম সম্পুরক খাদ্যে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান বিদ্যমান থাকে এবং তা ব্যয় বহুলও বটে। বর্তমানে বেসরকারী উদ্যোগে মাছের খাদ্যে বাণিজ্যিকভাবে তৈরি করার জন্য বহু খাদ্য কারখানা স্থাপিত হয়েছে। এ সকল কারখানা মাছের প্রজাতি ও বয়সের ওপর ভিত্তি করে প্রযোজনীয় মাত্রায় পুষ্টি উপাদান বিশেষতঃ আমিষের মাত্রা নিশ্চিত করে, বিভিন্ন আকারের দানাদার ভাসমান খাদ্য তৈরি করে থাকে। খাঁচায় মাছচাষের ক্ষেত্রে খাদ্য নির্বাচনে খাদ্যের দানার আকার মাছের মুখের আকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে খাদ্য দানার আকার নির্বাচন করতে হবে।

খাদ্য প্রয়োগ মাত্রা ও কৌশল

খাঁচায় মাছচাষে খাদ্য প্রয়োগ করতে হয় মাছের চাহিদার ভিত্তিতে। খাঁচায় ভাসমান খাদ্য প্রয়োগ করাই শ্রেয়। প্রতিটি খাঁচায় দিনের নির্ধারিত সময়ে অল্প অল্প করে খাদ্য সম্পূর্ণ ছিটিয়ে দিতে হবে এবং পর্যবেক্ষণ করতে হবে যেন খাঁচায় খাদ্যের কোন অংশ অব্যবহৃত থেকে গেল কীনা? খাঁচায় পোনা মজুদের পর হতে বাজারজাতকরণের পূর্ব পর্যন্ড় যে খাদ্য প্রদান করা হয় তাতে দৈহিক ওজনের বিবেচনায় খাদ্য প্রয়োগের মাত্রা ৮-৩% এর মধ্যে সীমিত রাখতে হবে। অনেক সময় মাছ দেহ ওজনের ১% এর কম খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। খাঁচায় খাদ্য প্রয়োগে নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনা আনতে হবে ঃ

- মেঘলা আবহাওয়ায় বা বৃষ্টির দিনে বা নিম্নচাপের সময় খাঁচায় খাদ্য প্রয়োগ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হবে কিংবা কমিয়ে দিতে হবে।
- যে কোন কারণে খাঁচায় মাছের ওপর পীড়ন অবস্থার সৃষ্টি হলে খাদ্য প্রয়োগ কমিয়ে দিতে হবে এবং প্রয়োজনে বন্ধ রাখতে হবে। অন্যথায় খাদ্য অপচয় হয়ে পরিবেশ বিনষ্ট করবে।

মাছের নমুনায়ন, গ্রেডিং ও খাঁচার পরিচর্যা

খাঁচায় মাছচাষের জন্য নমুনায়ন অপরিহার্য্য। মাছের দৈহিক বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যগত অবস্থা পর্যবেক্ষণ, মাছের ওজন নির্ধারণ ও সে অনুপাতে খাবারের পরিমাণ পরিমাপ করা ইত্যাদি কার্যক্রমের জন্য নমুনায়ন অত্যন্ড় গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক ব্যবস্থাপনা ও যথাযথ নিয়মে খাদ্য প্রদানের মাধ্যমে চেষ্টা করা হলেও মাছের বৃদ্ধির তারতম্য ঘটে। এজন্য নির্দিষ্ট সময় পর পর প্রতিটি খাঁচা থেকে মাছ বাছাই করে বড় ও ছোট মাছগুলোকে গ্রেডিং করে ভিন্ন ভিন্ন খাঁচায় স্থানান্ড়র করতে হবে। তা'ছাড়া মাছের স্বাস্থ্য পরিচর্যার সাথে সাথে নিয়মিত খাঁচারও পরিচর্যা করতে হবে।

বাছাই বা গ্রেডিং এর প্রয়োজনীয়তা

- প্রতিটি মাছ যাতে সমভাবে খাদ্য গ্রহণ করতে পারে।

- প্রতিটি মাছের দেহ বৃদ্ধি যাতে সমভাবে লাভ করে ফলশ্রুতিতে সার্বিক উৎপাদন বেশি হয়।
- ভাল বাজার মূল্য পাওয়া যায়।
- গ্রেডিং করতে গেলে সাথে সাথে মাছের সার্বিক অবস্থাও পর্যবেক্ষণ করা যায়।
- দৈহিক বৃদ্ধির সাথে খাদ্য প্রদান সামঞ্জস্যপূর্ণ কীনা তা যাচাই করা যায়।
- সঠিকভাবে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা করা যায়।
- গ্রেডিং করতে গিয়ে নিয়মিত পরিচর্যার অংশ হিসাবে খাঁচার জালের কোথাও ছিঁড়ে গেলে তা মেরামত করা যায়।

মাছের নমুনায়ন ও খাঁচার পরিচর্যা

- প্রতি ১৫ দিনে একবার করে প্রতিটি খাঁচা থেকে মাছের নমুনা সংগ্রহ করে খাঁচা প্রতি মাছের ওজন বের করে খাবারের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। তা'ছাড়া কোন প্রকার সমস্যা আছে কীনা তা জানার জন্য মাছের শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- কমপক্ষে ২ সপ্তাহ পর পর খাঁচার গায়ে লেগে থাকা শেওলা খুব ভালভাবে পরিস্কার করতে হবে যাতে খাঁচার পানি চলাচলে কোন প্রকার বাধা না থাকে। তাতে খাঁচার পরিবেশ ও পানির অক্সিজেন মাত্রা ভাল থাকবে।

খাঁচার মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ

আহরণযোগ্য মাছের আকার ও ওজন, বাজার চাহিদা, চাষের মেয়াদ ও ব্যবস্থাপনার ধরন বিবেচনায় রেখে মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। খাঁচায় সব মাছ একত্রে বাজারজাতকরণের উপযোগী আকার হয় না। বড় মাছগুলো বাছাই করে বাজারে প্রেরণের জন্য পৃথক করে এক বা একাধিক খাঁচায় রাখতে হবে। এতে একদিকে যেমন একই আকারের মাছ গ্রেডিং করার কারণে উপযুক্ত মূল্য পাওয়া যায়, অন্যদিকে ধীরে ধীরে ছোট মাছগুরো বড় হওয়ার জন্য অতিরিক্ত স্থান ও সময় পাবে।

আহরণপূর্ব বিবেচ্য বিষয়

মাছ আহরণের সিদ্ধান্তগ্রহণের পূর্বে নিম্নে উল্লিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা প্রয়োজন ঃ

- মাছের আকার ও ওজন।
- বাজার মূল্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া।
- বাজার বা ক্রেতা নির্ধারণ করা।

- দ্রুত মাছ বাজারে পৌঁছানোর জন্য পরিবহন ব্যবস্থা ঠিক করা।
- বাজারে প্রেরণের আগে মাছ পরিমাপের জন্য উপযুক্ত পরিমাপক যন্ত্রের ব্যবস্থা করা।
- মাছ জীবন্ত অবস্থায় বাজারজাতের জন্য প্লাস্টিক কন্টেইনার বা ড্রাম এর ব্যবস্থা করা।
- দূরের বাজারে মাছ প্রেরণের আগে প্রয়োজনীয় পূর্ব প্রস্তুতি যেমন প্যাকিং, উপযুক্ত পাত্র, বরফ ইত্যাদি নিশ্চিত করা।

আহরণযোগ্য মাছের ওজন

আহরণকৃত মাছের ওজনের সাথে বাজার চাহিদা ও উৎপাদন মেয়াদের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ সব বিষয় বিবেচনা করে খাঁচায় এমন মাছ চাষ করা ভাল যে সমস্ত মাছ কম সময়ে বাজারজাত করা যায়। সেজন্য সঠিক ব্যবস্থাপনায় মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষ করলে ৫-৬ মাস পর মৎস্য আহরণ করে বাজারজাত করা যায়। মনোসেক্স তেলাপিয়া ৫-৬ মাসে প্রতিটি প্রায় ৩০০-৩৫০ গ্রাম ওজনের হয়ে থাকে। সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা করলে মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষ করে বছরে ২টি ফসল উৎপাদন করা যেতে পারে। ভালভাবে ব্যবস্থাপনা করলে ৪০-৬০ কেজি/প্রতি ঘন মিটার/প্রতি বছর উৎপাদন করা যেতে পারে।

মাছ আহরণ

খাঁচায় চাষকৃত মাছ দুইভাগে আহরণ করা যায়। আংশিক আহরণ ও সম্পূর্ণ আহরণ। খাঁচা থেকে মাছ আহরণ করা সহজ এবং তুলনামূলকভাবে কোন ব্যয় নাই বললেই চলে। খাঁচা থেকে মাছ আহরণ মূলতঃ আংশিক আহরণ পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়ে থাকে। এর ফলে-

- ছোট মাছগুলো দ্রুত বড় হওয়ার সুযোগ পায়।
- মোট মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।
- চুরি ও প্রাকৃতিক দূর্যোগের ঝুঁকি অনেক কমে যায়।
- সময়মত বিক্রয় করে ভাল বাজার মূল্য পাওয়া যায়।
- চাষকালীন চাষিকে পুঁজির যোগান দেয়।

মাছ আহরণ ও বাজারজাত পদ্ধতি

খাঁচার মাছ বাজারজাতকরণের আগের দিন বিভিন্ন খাঁচা হতে বাজারজাত উপযোগী আকারের মাছকে বাছাইয়ের মাধ্যমে বাজারজাতের জন্য স্থাপিত খাঁচায় বা অন্য কোন খাঁচায় মজুদ করতে হবে এবং এদেরকে ঐদিন দুপুরের পর থেকে কোন খাবার প্রদান করা যাবে না। ফলে বাজারজাতকরণের পর মাছ মারা গেলেও মাছের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ও

গুণগত মান অধিক সময় পর্যন্ড় অক্ষুন্ন থাকে। নিকটতম বাজারে উপযোগী পাত্র বা ড্রামে পানিতে পরিমিত সংখ্যায় জীবন্ড় অবস্থায় সরবারাহ করা হয় অথবা দূরবর্তী বাজারে বরফ দ্বারা সংরক্ষন করে পাঠানো যায়।

মাছ বাজারজাতকরণ

খাঁচা হতে সাধারণতঃ বড় আকারের মাছ বাজারজাত করা হয়। তাই এসব মাছের বাজারমূল্য বেশি হয়। কিন্তু এসব মাছ খাঁচার পাশেই পাইকারের কাছে বিক্রয় করলে বেশিরভাগ সময়ই ভাল দাম পাওয়া যায় না। খাঁচায় চাষকৃত মাছ ভাল দামে বিক্রয়ের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

- দলীয়ভাবে একত্রে খাঁচায় উৎপাদিত মাছ বিক্রয় করা।
- জীবন্ড় অবস্থায় মাছ বিক্রয় করা।
- হ্যাচারি ও পুকুর মালিকদের সাথে যোগাযোগ রেখে ব্র ন্ড হিসেবে মাছ বিক্রয় করা।
- বছরের কিছু নির্দিষ্ট সময় যখন চাহিদা বেশি ও সরবরাহ কম থাকে সে সময়ে মাছ বিক্রয় করা।
- মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছে বিক্রয় না করে নিজেই খুচরা বাজারে বিক্রয় করা।

খাঁচায় মাছচাষে বিশেষ করণীয় দিক-

- খাঁচার ভিতরের ও খাঁচার আশেপাশের নিয়মিত পানির গুণাগুণ এবং মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে।
- মৃত বা অসুস্থ মাছ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খাঁচা থেকে উঠিয়ে ফেলতে হবে।
- মেঘলা অথবা বর্ষাঘন দিনে খাবার দেয়া বন্ধ রাখাই শ্রেয়।
- খাঁচা হতে মাছ যদি লাফ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেক্ষেত্রে জালের তৈরি ঢাকনা ব্যবহার করা।
- খাঁচার বাহিরের দিক নিয়মিত ব্রাশ দিয়ে পরিস্কার করতে হবে যাতে খাঁচার ভিতরের ও বাহিরের পানি চলাচল করতে পারে। প্রয়োজনে বিকল্প হিসেবে ১-২ দিন খাবার বন্ধ রাখলে মাছ খাঁচার গায়ে লেগে থাকা শেওলা খেয়ে ফেলবে।
- মাছ আহরণের পর দ্বিতীয় বার ব্যবহারের পূর্বে খাঁচা পানি থেকে উঠিয়ে ভালভাবে শেওলা পরিষ্কার করে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে।
- কোন একটি খাঁচার মাছ রোগাক্রান্ড় হলে অন্যান্য খাঁচার মাছও দ্র ত আক্রান্ড় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সে জন্য রোগাক্রান্ড় মাছ খুব তাড়াতাড়ি সরায়ে ফেলতে হবে যাতে সহজে সক্রমিত না হতে পারে
- সতর্ক পাহারার ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে মাছ চুরি না যায় এবং
- ঝড়ো আবহাওয়া এবং অত্যাধিক বৃষ্টিপাতে যেন মাছ বেরিয়ে না যায় সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে

পেনে মাছ চাষ

কোন উন্মুক্ত বা আবদ্ধ জলাশয়ে বা বিলের নির্ধারিত কোন অংশে এক বা একাধিক দিক থেকে নাইলনের নেট বা বাঁশের বানা বা অন্যকোন উপায়ে ঘেরাও করে আয়তাকার, গোলাকার বা যে কোন আকৃতির কাঠামো তৈরি করে তার ভিতরে পোনা মাছ মজুদ করে মাছের চাষকে পেনে বা ঘেরে মাছ চাষ বলে। দেশে মৎস্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে না এমন বৃহদাকৃতির জলাশয় কিম্বা সেঁচ খাল ইত্যাদিতে পেন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধিসহ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব। বাংলাদেশের বিলগুলির অধিকাংশই একসময় সরকারী খাস জলাশয় ছিল। কিন্তু বর্তমানে নানাবিধ কারণে পলিভরাট হয়ে ধানচাষের আওতায় এসে বিলগুলি ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিণত হয়েছে বা হচ্ছে। সরকারী সম্পতি থাকলেও তার পরিমাণ খুবই কম। সেহিসেবে সারা দেশের বিলগুলি বর্তমানে সরকারী সম্পতির পাশাপাশি বহুমালিকানাধীন বিধায় পেনে মাছচাষ খুবই উপযোগী। মৎস্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে না এমন বৃহদাকার জলাশয় বা বিলে পেন পদ্ধতিতে মাছ চাষ করা যায় এবং বিলের পেনে মাছচাষে মৎস্যজীবী এবং বিলের তীববর্তী জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে বিলে মাছের উৎপাদন বাড়ানোসহ বেকারত্ব দুর করা সম্ভব। পেনচাষ পদ্ধতিতে যদি কয়েকজন মালিক বা সুফলভোগী দল বা সংগঠন করে পেন চাষ করে তা'হলে এটা আরও বেশি কার্যকরী হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে উন্মুক্ত জলাশয় বিশেষকরে বিলে বা প□াবনভূমিতে পেনে মাছচাষ বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

পেনে মাছ চাষের সুবিধা এবং অসুবিধা

সুবিধা

- সাধারণতঃ মুক্ত জলাশয়ে আয়তনের সীমাবদ্ধতা না থাকায় যে কোন আয়তনের পেন নির্মাণ করা যায় এবং বন্যাপ□াবিত, আধা উন্মুক্ত, উন্মুক্ত জলাশয়কে এই চাষের আওতায় সহজেই আনা যায়।
- অব্যবহৃত জলাশয় থেকে আয়ের একটা উৎস তৈরি হয়।
- ব্যবস্থাপনা কষ্টসাধ্য এরূপ জলাশয় উৎপাদনের আওতায় আনা যায় এবং স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করেই পেন তৈরি করা যায়।
- পেনে সাধারণতঃ অক্সিজেনের অভাব না থাকায় অধিক সংখ্যক মাছের চাষ করা যায়।
- পেনের ভিতর দিয়ে সব সময় পনির প্রবাহ থাকায় মাছের প্রাকৃতিক খাদ্যের অভাব হয় না

- পেনের পানি দুষিত হওয়ার আশংকা থাকে না।
- অল্প মুলধন, স্বল্প সময় ও কম খরচে মাছ উৎপাদন করা যায়।
- সমাজভিত্তিক বা সমবায়ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ব্যবহার করা যায

অসুবিধা

- মাছ চুরি হবার সম্ভাবনা থাকে।
- পেন তৈরির উপকরণ যোগান ব্যয়বহুল এবং সহজেই নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে।
- শুত্র্তাবশত পেন নষ্ট করে ফেলা বা পেন থেকে মাছ বের করে দেয়া সহজ।
- প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত্রহবার সম্ভাবনা থাকে।
- পানি দূষণের ফলে মাছে মড়ক দেখা দিতে পারে।

স্থান নির্বাচন

পেনে লাভজনকভাবে মাছচাষের জন্য স্থান নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেসব বৃহৎ বিল সাধারণভাবে মাছচাষের আওতায় আনা সম্ভব নয় সে সকল বিল বা জলাশয় পেনে মাছচাষের জন্য নির্বাচন করা যেতে পারে। তবে যে সমস্ত জলাশয়ের তলদেশ অত্যন্ত অসমান, পাথর দ্বারা আবৃত, পানি দুষণসহ ঝড়ো হাওয়ায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে বা নৌযান চলাচল করে সে সকল স্থান বাদ দিয়ে উন্মুক্ত জলাশয়ের যে কোন স্থানে পেন তৈরি করা যেতে পারে। বছরে অন্তত ৬-৮ মাস পানি থাকে এমন মৌসুমী বিলও পেনে মাছ চাষের জন্য উপযুক্ত।

পেন তৈরির উপকরণ ও পেন নির্মাণ

বাশ ও বাঁশের বেড়া, টায়ার, কর্ড জাল বা গিট বিহীন পলিইথিলিন জাল (জালের ফাঁস ১০ মিমি এর কম, তবে ফাঁসের আকার নির্ভর করে মজুদকৃত পোনার আকারের ওপর) উপকরণ দ্বারা পেন তৈরি করা যায়। সাধারণতঃ বিলের প্রস্থ কম হলে বিলের একপাশ থেকে আরেক পাশ পর্যন্ত আড়াআড়িভাবে খুঁটি পুঁতে বেড়া দিয়ে পেন তৈরি করা যায়। জাল দিয়ে বেড়া দেয়ার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন জালের ফাঁস ১০ মিমি. এর বেশি না হয়। পেন তৈরির সময় টায়ার কর্ড জাল বা নটলেস পলিইথিলিন জালও ব্যবহার করা প্রয়োজন। জলাশয়ের ধরণের ওপর পোনার আকার নির্ভর করে। জলাশয়ের মালিকানা, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে ১ হেক্টর হতে ১০০ হেক্টর আয়তনের যে কোন আকৃতির জলাশয়ে পেন নির্মাণ করা যেতে পারে। পেনের আয়তন খুব বেশি বড় হলে কখনও কখনও ব্যবস্থাপনার অসুবিধা দেখা দেয। আবার আয়তন অত্যন্ত ছোট হলে তুলনামূলকভাবে পেনের চেয়ে নির্মাণ ব্যয় বেশি পড়ে। সাধারণতঃ ১ হতে ৫ হেক্টর আয়তনের পেনে মাছচাষ ও ব্যবস্থাপনা সবচেয়ে ভাল।

যে সমস্ড় এলাকায় পানি প্রবাহ বেশি সেসব এলাকায় বাঁশ দ্বারা উঁচু বানা তৈরি করে তলদেশের মাটির মধ্যে বেশি করে বানা পুঁতে দিতে হবে। পানির চাপে তলদেশের বালি বা নরম মাটি যেন সরে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বানার উপর দিকে জাল দিয়ে দিতে হবে যেন মাছ লাফ দিয়ে না যেতে পারে। তা'ছাড়া সম্ভব হরে বানার বাহির দিক থেকে ঘন মেস সাইজের জালের আবরণ দেয়া যেতে পারে। ভাল বাঁশের বেড়া বা বানা এবং খুঁটি সাধারণতঃ ১-২ বৎসর ব্যবহার করা যায়। তবে কাঠের খুঁটি ২-৩ বৎসর টিকে। গীটবিহীন পলিইথিলিন জাল ৪-৫ বৎসর ব্যবহার করা যায়। আবার টায়ার কর্ড জালের আয়ুস্কাল ২-৩ বৎসর। বাঁশ দিয়ে বানা তৈরির জন্য নারিকেলের দড়ি বা সিনথেটিক দড়ি ব্যবহার করা ভাল এবং এসব দড়ি ১-২ বৎসর টেকে থাকে। এ ছাড়া বানা বাঁধার জন্য জিআই তার ব্যবহার করা যেতে পারে ও জিআই তারের আয়ুস্কালও প্রায় ১-২ বৎসর।

মাছচাষ পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা

রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ এবং আগাছা দমন

পেন তৈরির পর পেনের ভিতর জাল টেনে যতদূর সম্ভব রাক্ষুসে (শোল, বোয়াল, গজার, আইড়, টাকি ইত্যাদি) এবং অবাঞ্ছিত মাছ (বেলে, পুঁটি, দারকিনা, মলা, চাপিলা, চান্দা, ছোট ছোট চিংড়ি ইত্যাদি) সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা নিতে হবে। এ ছাড়া পেনের ভিতরের ও আশে পাশের জলজ আগাছা সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে ফেলতে হবে। পানির প্রবাহসহ বাইরের পানির সাথে সংযোগ থাকার জন্য মাছ মারার ওষধ প্রয়োগ খুব বেশি কার্যকর হয় না বিধায় জাল টেনে অবাঞ্ছিত মাছ ও আগাছা দমন করাই উত্তম।

পেন চাষে মাছের প্রজাতি নির্বাচন

পেনে চাষের জন্য মাছের প্রজাতি নির্বাচন একটি গুর"ত্বপূর্ণ বিষয়। বিভিন্ন প্রজাতির এমন সব মাছ ছাড়তে হবে যারা পানির সকল স্ড়রের খাবার খায়, যাদের খাদ্য শিকল সংক্ষিপ্ত ও যাদের পোনা সহজে সংগ্রহ করা যায় এবং অল্প সময়ে চাষ করে বাজারে বিক্রির উপযোগী হয়। এ সব দিক বিবেচনা করে র"ই, কাতলা, মৃগেল, সিলভার কার্প, বিগহেড কার্প, গ্রাস কার্প, রাজপুঁটি, তেলাপিয়া, পাঙ্গাস প্রজাতির মাছ পেনে চাষ করার জন্য উপযোগী। তাছাড়া পেনে গলদা চিংড়ি চাষ করাও সম্ভব।

পোনা মজুদ হার

অধিক ফলনের জন্য সুস্থ ও সবল পোনা নির্দিষ্ট হারে মজুদ করতে হবে। পোনা মজুদের সময় পোনার আকার কোন ক্রমেই ১০ সেমি. এর কম না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ ছোট পোনা পেনের বেড়া বা জালের ফাঁস দিয়ে বের হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া পেন থেকে সকল রাক্ষুসে মাছ সম্পূর্ণরূপে সরিয়ে ফেলা অনেক সময় সম্ভব হয় না এবং পেনে মাছচাষের সময়কাল তুলনামূলকভাবে কম হওয়া বড় পোনা ছাড়লে কম সময়ে বাজার উপযোগী মাছ উৎপাদন করা যায়। সেজন্য পেনে বড় আকারের পোনা ছাড়াই উত্তম।

পেনে হেক্টর প্রতি ১০ সেমি. আকারের ১২০০০-১৫০০০টি রুই, কাতলা, মৃগেল, সিলভার/বিগহেড কার্প, গ্রাসকার্প, রাজপূটি, তেলাপিয়া, পাঙ্গাস মাছের পোনা মজুদ করা যেতে পারে। পেনে মনোসেক্স তেলাপিয়ার একক চাষ করা যেতে পারে। মিশ্র মাছের চাষ করলে পুকুরে মাছ চাষের মতই জলাশয়ের বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী মাছের মজুদ অনুপাত অনুসরণ করতে হবে। উপরের স্তরের জন্য শতকার ৩০%, মধ্যস্তরের জন্য ৩০% এবং নিচের স্তরের জন্য ৩০% এ অনুপাতে বিভিন্ন স্তরের মাছ মজুদ করতে হবে। পেনে মনোসেক্স তেলাপিয়ার একক চাষও করা যায়, তবে লক্ষ্য রাখতে হবে কোনক্রমেই যেন তেলাপিয়ার পোনা পেনের বাহিরে না যায়। তেলাপিয়ার চাষ করলে সাবধানতার জন্য পেনের বানা বা বাঁশের বেড়ার চারিদিক সুক্ষ নাইলন সুতার জাল দিয়ে দিতে হবে যাতে তেলাপিয়ার পোনা বা ডিম পেনের বাহিরে যেতে না পারে। মনোসেক্স তেলাপিয়ার একক চাষের ক্ষেত্রে ৭-১০ সেমি. আকারের মনোসেক্স তেলাপিয়ার পোনা হেক্টর প্রতি ৪০-৫০ হাজার মজুদ করা যায়।

পেনে খাদ্য সরবরাহ ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা

পেনে মাছ চাষের ক্ষেত্রে অবশ্যই সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। সহজলভ্য খাদ্য যেমন-খৈল, কুঁড়া, ভূষি, আটা, চিটাগুড়, ইত্যাদি প্রয়োগ করা যেতে পারে। নিজেরা খাদ্য তৈরি করলে বিভিন্ন খাদ্য উপকরণের অনুপাত খৈল-৩৫%, কুঁড়া-৩০%, ভূষি-৩০%, আটা-৩% ও চিটাগুড় ২% হারে মিশ্রিত করলে ভাল। বর্তমানে বাজার হতে প্রাপ্ত বানিজ্যিক পিলেট খাবারও পেনে প্রয়োগ করা যায়। তবে বানিজ্যিক খাবার বা হাতে তৈরি খাবার যাই হউক না কেন খাদ্যে যেন আমিষের পরিমাণ ২৫-৩০% থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। মাছের দেহের ওজনের ২-৩% হারে প্রতিদিন খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। তবে ছোট অবস্থায় আরও বেশি পরিমাণের খাবারের প্রয়োজন হতে পারে। নির্ধারিত পরিমাণ খাবার দিনে দুইবার ভাগ করে সকাল ও বিকালে খাবার দানী বা ট্রেতে খাবার দেয়া উত্তম।

মৎস্য আহরণ

পেনে পোনা মজুদের ৬-৮ মাস চাষের পরই বিক্রয়যোগ্য মাছ পাওয়া যায়। যে সমস্ত জলাশয়ে বা বিলে সারা বৎসর পানি থাকে সে সমস্ত জলাশয় হতে বাৎসরিক ভিত্তিতে মাছ আহরণ করা যেতে পারে। মনোসেক্স তেলাপিয়ার

সাধারণত ৩-৪ মাস পর আহরণ করে বাজারজাত করা যায়। বাজারজাতকণের ক্ষেত্রে আংশিক আহরণ করা ভাল। গ্রেডিং ও বাছাই করে বড় মাছগুলো আগে আংশিকভাবে আহরণ করে বাজারজাত করলে ছোট মাছগুলো কম ঘনত্বে তাড়াতাড়ি বড় হভে। তবে বাজারের চাহিদা ও বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ করে মাছ আহরণ করতে হবে। প্রজাতি অনুযায় জীবন্ড় মাছ বাজারজাত করতে পারলে বেশি মূল্য পাওয়া যায়। সঠিক ভাবে পেনে মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষ করলে উৎপাদন ৯-১০ মেট্রিক টন/হেক্টর উৎপাদন হতে পারে।

পেনে চাষের জন্য বিশেষ করণীয় দিক

- বড় আকারের পোনা মজুদ নিশ্চিত করতে হবে।
- বড় আকৃতির পোনা মজুদ করতে পারলে কম সময়ে উৎপাদন ভাল হয়।
- পেনে চাষের জন্য সুষম খাদ্য প্রয়োগ করাই উত্তম।
- অপরিকল্পিতভাবে পার্শ্ববতী কৃষি জমিতে কীটনাশকের প্রয়োগ পেনে মাছচাষে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। তাই বিল এলাকার আশে পাশে অপরিকল্পিত কীটনাশকের ব্যবহার রোধ করতে হবে।
- পেনে চাষকৃত মাছের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষাসহ বানা, জাল ইত্যাদির অবস্থা সম্পর্কে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ক্ষতিকর জলজ প্রাণী যেমন কাঁকড়া যেন পেনের জাল কেটে ফেলতে না পারে সে দিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে।
- বিলে পেনে মাছচাষের ক্ষেত্রে সমাজভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করে সকলে মিলে মাছচাষ করলে ব্যবস্থাপনা সুবিধা হয়।

বিল নার্সারি ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ হাওর-বাঁওড়ের দেশ। এদেশে রয়েছে অসংখ্য মৎস্য চাষপোযোগী বিল, উন্মুক্ত বা বদ্ধ প্রাকৃতিক জলাশয়। এসব প্রাকৃতিক জলাশয়ে মাছের মজুদ বৃদ্ধি করে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য পোনা অবমুক্ত করণ একটি কার্যকরী পদক্ষেপ। এসব জলাশয়ে মাছের পোনা অবমুক্ত করার নিমিত্ত সংশি□ষ্ট বিল বা জলাশয় এলাকায় নার্সারি স্থাপন করা একটি কার্যকরী ও উত্তম পন্থা। বিল নার্সারিতে পোনা উৎপন্ন করলে বর্ষার সময়ে বিল নার্সারিগুলো প□াবিত হয়ে নার্সারির পোনা বিলের মধ্যে আপনা আপনি ছড়িয়ে পড়ে বড় হবে ও বংশ বৃদ্ধি করবে। ফলে জলমহালের সামগ্রিক মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। দূর থেকে পোনা ক্রয় বা সংগ্রহ করে দীর্ঘ পথে পরিবহন করার পরিবর্তে বিলে অবমুক্ত করার চেয়ে শুকনা মৌসুমে বিল পাড়ে বা বিলের কোন অংশে নার্সারি করে চারা পোনা তৈরি করা উত্তম। বিল নার্সারি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যদি সংশি□ষ্ট বিলের কোন অংশে রেণু পোনা মজুদ করে পোনা উৎপাদন করা যায় তবে বর্ষা মৌসুমে উক্ত পোনা বিলে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এসব দিক বিবেচনা করে বিলে মাছে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিল নার্সারির গুরুত্ব অপরিসীম। বিল নার্সারিতে ভালো মানের পোনা প্রতিপালন করে বিলে মজুদ করলে এর উৎপাদনশীলতা বহুগুনে বৃদ্ধি পায়। নিম্নে বিলের জন্য নার্সারি ব্যবস্থাপনা কৌশল আলোকপাত করা হলো।

বাংলাদেশে অভ্যন্ড়রীণ জলাশয়ের শতকরা ৯৪ ভাগ হচ্ছে মুক্ত জলাশয় এবং ৬ ভাগ হচ্ছে বদ্ধ জলাশয়। বাস্ড়ব সত্য এই যে, প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত কারনে মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন পূর্বের তুলনায় অনেক হ্রাস পেয়েছে। বিপরীত দিকে বদ্ধ জলাশয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর সাথে বর্তমানে মুক্ত জলাশয়ে পোনা ছেড়ে চাষ ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ফলে দেশের ক্রমবর্ধমান পুষ্টির চাহিদা পূরন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জাতীয় অর্থনীতিতে মাছচাষ এক সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হিসেবে বিকাশ লাভ করবে।

মাছ চাষের পূর্ব শর্ত হচ্ছে সুস্থ্য সবল উন্নত জাতের পোনা সরবরাহ নিশ্চিত করা। এর জন্য প্রয়োজন পোনাচাষে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা। রেণু অবস্থায় মাছের জীবন চক্র অত্যন্ড় নাজুক। তাই রেণু পোনা থেকে

বড় পোনা উৎপাদনের সময় পোনার মৃত্যুর হার কমানোর জন্য নার্সারি পুকুর ব্যবস্থাপনায় আধুনিক পদ্ধতি অনুসরণ করা আবশ্যক।

চারা রোপনের পূর্বে গাছের বীজ বা চারা গুলোকে যেমন ছোট এক টুকরো জমি বা বীজ তলায় অতি যত্ন সহকারে লালন পালন করে বড় করতে হয়। তেমনি মাছের রেণু পোনাকে প্রথমতঃ ছোট একটি পুকুর বা জলাশয়ে বা অঁতুর পুকুরে লালন পালন করে একটু বড় ও সবল হলে অপেক্ষাকৃত বড় পুকুরে ছেড়ে অত্যন্ড় যত্ন সহকারে প্রতিপালন করে উন্মুক্ত জলাশয়ে ছাড়ার জন্য উপর্যুক্ত করে বড় করা যায়। এই প্রক্রিয়ায় সময় লাগে প্রায় ৫-৮ সপ্তাহ।

বিল নার্সারির ধারণা

প্রতিনিয়ত পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে অভ্যন্ড়রীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে মুক্ত জলাশয়ে মাছের বংশ রক্ষা ও উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে জলাশয়ে পোনা অবমুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সুফলভোগী মৎস্যজীবীগণ বিলের মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে, পোনা মজুদ তার অন্যতম। পোনা মজুদের ক্ষেত্রে সুফলভোগীগণ সময়মত কাঙ্খিত প্রজাতির সঠিক আকারের পোনা প্রাপ্তি ও পোনার গুণগতমান সম্পর্কে অনিশ্চয়তা এবং পরিবহনের সময় অধিক পোনার মৃত্যু ইত্যাদি কারণে প্রায়শঃই ক্ষতির সম্মুখীন হন। সুফলভোগীদের মাধ্যমে বিলের পাশে নার্সারি স্থাপন করে পোনা প্রতিপালন করে বিলে পোনা মজুদের ব্যবস্থা নিলে বিলের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা সম্ভব। এমনকি সঠিক জায়গায় বিল নার্সারি স্থাপন করলে উৎপাদিত পোনা বর্ষার পানিতে প্লাবিত হয়ে আপনা আপনি বিলে ছড়িয়ে পড়বে, বড় হবে, ফলে দেশের সামগ্রিক মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

বিল নার্সারির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

বিলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে বিলের প্রজননক্ষম মাছ সংরক্ষণ, পোনা অবমুক্তি ইত্যাদির পাশাপাশি বিল নার্সারির মাধ্যমে পোনা মজুদ করতে পারলে বিলের জীববৈচিত্র রক্ষার সাথে সাথে মাছের উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে। সে হিসেবে বিল নার্সারির গুরুত্ব অপরিসীম। যেমন-

- বিল পাড়ে বা বিলে নার্সারি স্থাপন করে চারা পোনা হবার পর যখন বর্ষা হবে তখন আপনা আপনি নার্সারিগুলো প্লাবিত হয়ে বিলে পোনা চলে যাবে।
- বিল নার্সারি হতে অবমুক্ত পোনা তুলনামূলকভাবে বেশি সুস্থ থাকায় এবং বিলের পরিবেশের সাথে প্রায় অভ্যস্ড় থাকে। ফলে পোনার বাঁচার হার বেশি হয় এবং তাদের বৃদ্ধিও তুলনামূলকভাবে বেশি হয়।
- বিল নার্সারিতে পোনা উৎপাদন করলে পোনা পরিবহন ঝুঁকি কম।

- বিল নার্সারির মাধ্যমে পোনা উৎপাদন করে বিলে অবমুক্ত করলে মাছের উৎপাদন তুলনামূলকভাবে বেশি বৃদ্ধি পাবে।
- বিলে মাছের উৎপাদন বাড়লে জেলেদের কর্মসংস্থান এবং জীবন-জীবিকার ব্যবস্থা হবে। এছাড়া বাজারে মাছের চাহিদা কিছুটা হলেও পূরণ হবে।
- বিল নার্সারি স্থাপন শুধু জরুরিই নয় সময়ের দাবীও বটে।

বিল নার্সারির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র বিমোচন, বেকারত্ব হ্রাস, সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি, সামাজিক বৈষম্য হ্রাস, স্থায়িত্বশীল মৎস্য উৎপাদনের মাধ্যমে বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব।

স্থান নির্বাচন

বিল নার্সারি স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। আঁতুর পুকুরে নার্সারি স্থাপন ও বিল নার্সারি স্থাপনের মূল কার্যক্রম এক রকম হলেও স্থান নির্বাচনে এর ভিন্নতা রয়েছে। বিল নার্সারি স্থাপন করতে হবে বিলের গভীরতম অংশে সেখানে চৈত্র-বৈশাখ মাসে পানি থাকে অথবা বিলের এমন কোন অংশে, যেখানে বর্ষা মৌসুমে প্লাবিত হয়ে পোনাগুলো আপনা-আপনি বের হয়ে যেতে পারে। এতে করে পোনা পরিবহনের ঝক্কি-ঝামেলা নাই এবং পোনার বাঁচার হারও অনেক। বিলের কোন গভীর অংশ যেখানে শুকনা মৌসুমে পানি থাকে এমন কোন স্থান বা বিলের কোন শুকনা অংশ যেখানে এক বা একাধিক পাড় তৈরি করলেই পুকুর হয়ে যাবে বা এক বা একাধিক পাড় পাতলা মশারীর কাপড়ের জাল দিয়ে ঘিরে আঁতুর পুকুর তৈরি করে নেওয়া যায়-এরূপ স্থান বিল নার্সারির জন্য নির্বাচন করা যেতে পারে। তা'ছাড়া যে সমস্ত মাছের পোনা হাপায় পালন করা যায় সে সমস্ত প্রজাতির পোনা বিলে হাপা স্থাপন করে প্রতিপালন করা যেতে পারে। বিল নার্সারির জন্য স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন ঃ

- নির্বাচিত স্থান বিল নার্সারি পরিচালনা বাস্তবায়নকালীন অর্থাৎ কমপক্ষে দুই মাস বন্যামুক্ত হতে হবে।
- পর্যাপ্ত আলো বাতাসপূর্ণ স্থানে হওয়ায় বাঞ্ছনীয়।
- বিল নার্সারি ব্যস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সামগ্রী (খাদ্য, ঔষধপত্র ও অন্যান্য উপকরণসমূহ) যথাযথভাবে সংরক্ষনের সুবিধা থাকতে হবে।
- দো-আঁশ মাটি নার্সারি পুকুরের জন্য উত্তম।
- দূষণমুক্ত পানি সরবরাহের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- রাক্ষুসে ও ক্ষতিকর প্রাণীমুক্ত অবস্থা। জলজ প্রাণীসহ অন্যান্য ক্ষতিকর প্রাণীর উপদ্রবমুক্ত থাকতে হবে।

- বিলের বাহিরে নার্সারি স্থাপনের প্রয়োজন হলে বিল এবং অন্যান্য স্থানের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল হতে হবে।
- জনবসতির পাশে যেখান থেকে প্রতিনিয়ত বিল নার্সারি পর্যবেক্ষণ করা যায়।
- রেণু পাওয়ার সহজলভ্যতা।
- বিলে পোনা ছাড়ার সুবিধা।

বিল নার্সারি স্থাপনের জন্য মাটির গুণাগুণ

মাটি ও পানির গুণাগুণের ওপরই মাছের পোনা উৎপাদন প্রাথমিকভাবে নির্ভর করে। ভাল মাটিতে যেমন ভাল ফসল হয় ঠিক তেমনি ভাল মাটির পুকুরেও মাছের ভাল উৎপাদন পাওয়া যায়। জলাশয়ের উৎপাদন ক্ষমতা প্রাথমিকভাবে মাটির ধরনের ওপর নির্ভর করে। উর্বর মাটিতে খনন করা পুকুরে সাধারণভাবে পোনা উৎপাদনও ভাল হয়। উর্বর মাটির পুকুর পোনার প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য অধিক পরিমাণে প্রয়োজনীয় পুষ্টির যোগান দেয়। সুতরাং পোনা চাষে মাটির গুণাগুণের গুরুত্ব অপরিসীম। পোনা উৎপাদনের ক্ষেত্রে মাটি ও পানির ভৌত-রাসায়নিক গুণাগুণ অন্যতম ভূমিকা পালন করে থাকে। পোনা মাছ তার জীবন ধারণের সব কাজ জলাশয়ের পানির মধ্যেই সম্পন্ন করে থাকে। এসব কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য নার্সারির জলজ পরিবেশের বিভিন্ন গুণাবলী যথাযথ মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা করা প্রয়োজন।

কোন জলাশয়ের পানি ধারণের আধার হলো মাটি। মাটিতে বিদ্যমান বিভিন্ন উপাদান পানির ভৌত রাসায়নিক গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ কোন জলাশয়ের উৎপাদন ক্ষমতা প্রাথমিকভাবে ঐ জলাশয়ের মাটির ধরনের ওপর নির্ভর করে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লাভজনকভাবে মাছ চাষের জন্য প্রয়োজন স্বাস্থ্যকর জলজ পরিবেশ এবং পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্যের পরিমিত প্রাচুর্যতা। পানির প্রাথমিক উৎপাদন ক্ষমতা প্রধানত: মাটির ভৌত রাসায়নিক গুণাগুণ তথা মাটির উর্বরতার ওপর নির্ভর করে।

পুকুরের মাটির গুণাগুণ যথাযথ মাত্রার না হলে নিম্নরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে ঃ

- পোনার প্রাকৃতিক খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদিত হবে না।
- বাহির থেকে দেয়া সম্পূরক খাদ্যের অপচয় হবে।
- পোনা মাছের বৃদ্ধি আশানুরূপ হবে না।
- পোনা মাছ রোগ বালাই-এ আক্রান্ত হবে ও মারা যেতে পারে।
- পোনার উৎপাদন কম হবে।

মাছ পানিতে বাস করে এবং জীবন ধারনের যাবতীয় খাদ্য গ্রহন করে পানি থেকে। সে জন্য পানির ভৌত-রাসায়নিক গুনাগুন মাছ চাষের জন্য প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে থাকে। ভাল মাটিতে যেমন ভাল ফসল হয় তেমনি ভাল মাটির বিল নার্সারিতেও মাছের ভাল উৎপাদন পাওয়া যায়। উর্বর মাটিতে বিল নার্সারি করা হলে সাধারণভাবে মাছের উৎপাদনও ভাল হয়। উর্বর মাটির বিল নার্সারি মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরির জন্য অধিক পরিমাণে প্রয়োজনীয় পুষ্টির যোগান দেয়। সুতরাং মাছচাষে মাটির গুণাগুণের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই বিল নার্সারি স্থাপনের জন্য জলাশয় নির্বাচন করতে হলে ঐ স্থানের মাটি সম্পর্কে সঠিক ধারণা নিতে হবে।

বিল নার্সারি স্থাপনের জন্য একটি আদর্শ জলাশয়ের মাটি ও পানির গুনাগুন

মাটির গুনাগুন (ভৌত-রাসায়নিক গুণাগুণ)		**পানির গুণাগুণ (ভৌত-রাসায়নিক গুণাগুণ)**	
মাটির গঠন	হালকা কাদাযুক্ত দো-আঁশ	পানির গভীরতা	
		(ক) আঁতুর পুকুর	১-১.৫ মিটার
পিএইচ	৬.৫-৭.৫	(খ) চারা মাছের পুকুর	১.৫-২ মিটার
জৈব কার্বন %	১.৫-২.৫	(গ) মজুদ পুকুর	২-৩ মিটার
জৈব পদার্থ %	২.৫-৪.৫	তাপমাত্রা (সেন্টিগ্রেড	২৫-৩৫° সে.
নাইট্রেজেন (মিগ্রা/১০০ গ্রাম)	৫০-৭৫	পিএইচ	৬.৫-৮.৫
		দ্রবীভূত অক্সিজেন (নিযুতাংশ)	৫.০-৭.০
ফসফরাস (মিগ্রা/১০০ গ্রাম)	১০-১২	কার্বন ডাই অক্সাইড	১.০-২.০০
		মোট ক্ষার ক্ষরত্ব (নিযুতাংশ)	৫০-১০০
পটাশিয়াম (মিগ্রা/১০০ গ্রাম)	৩-৪	সহজ প্রাপ্য ফসফরাস (নিযুতাংশ)	০.৫-১.০
		সহজ প্রাপ্য পটাশিয়াম	০.৫-১.০
ক্যালশিয়াম (মিগ্রা/১০০ গ্রাম	৩০-৪০	সহজ প্রাপ্য নাইট্রোজেন (নিযুতাংশ)	১-৩

বিলের প্রাকৃতিক উৎপাদনশীলতা কম হলেও সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে লাভজনক মাছচাষির জন্য বিল নার্সারিকে উপযোগী করে তোলা যায়। এক্ষেত্রে ব্যয় কিছুটা বেশি হয়। যে সমস্ত অঞ্চলের মাটি উর্বর সে স্থানে বিল নার্সারি স্থাপন করা হলে মাছের পোনাও ভাল উৎপাদন হয়। উর্বরা মাটি পানিতে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্যের যোগান দেয় এবং পানি দূষণ রোধে ভূমিকা রাখে। বিভিন্ন প্রকারের মাটির মধ্যে দো-আঁশ মাটির বিল নার্সারি সবচেয়ে উপযোগী। বিল নার্সারির স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে সেজন্য দো-আঁশ মাটির স্থানকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। দো-আঁশ মাটি না পাওয়া

গেলে এঁটেল-কাদা মাটি নির্বাচন করতে হবে। বিল নার্সারির জন্য বেলে মাটি নির্বাচন করা যাবে না বা না করাই উত্তম।

বিল নার্সারির পানির গুণাগুণ

প্রতিটি প্রাণীর সুন্দরভাবে বসবাসের জন্য তাদের উপযোগী স্বাস্থ্যকর বাসস্থানের প্রয়োজন। মাছের বাসস্থান হলো জলাশয় এবং জীবন ধারণের একমাত্র মাধ্যম পানি। সুতরাং মাছের সেই বাসস্থানও হওয়া চাই স্বাস্থ্যসম্মত। মাছের খাদ্য গ্রহণ, বেঁচে থাকা, দৈহিক বৃদ্ধি, প্রজনন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য পানির বিভিন্ন ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক গুণাবলীর একটি অনুকূল মাত্রা রয়েছে। নিচের অনুচ্ছেদে মাছ চাষে পানির গুণাগুণ বর্ণনা করা হলো।

পানির গুণাগুণ

পানির গুণাগুণ বলতে মাছের বেঁচে থাকা ও স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য পানির সহনশীল অবস্থাকে বুঝায়। পানিতে বিভিন্ন ধরনের গ্যাস, যেমন- অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, অনায়নিত অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন সালফাইড এবং মিথেন; অজৈব পদার্থসমূহ, যেমন- ফসফরাস, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়াম ইত্যাদি; দ্রবীভূত জৈব পদার্থ যেমন- এমাইনো এসিড, প্রোটিন, শর্করা, ফ্যাটি এসিড, ভিটামিন ও টেনিক এসিড; অদ্রবীভূত জৈব পদার্থসমূহ, যথা- ব্যাক্টেরিয়া, প্রোটোজোয়া, উদ্ভিদ ও প্রাণী-প্লাংকটন; অদ্রবণীয় জৈব পদার্থসমূহ যথা- মাটির কণা, ইত্যাদি বিভিন্ন মাত্রায় বিদ্যমান থাকে। এগুলো ছাড়াও কিছু ভৌত উপাদান, যেমন- তাপমাত্রা, পানির গভীরতা, আলো, ঘোলাত্ব ইত্যাদি পানির গুণাগুণের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। নিচে পানির গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণকারী ভৌত-রাসায়নিক ও জৈবিক উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

পানির ভৌত গুণাগুণ

পানির ভৌত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে পুকুরের উৎপাদন ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। পানির ভৌত গুণাগুণগুলো নিম্নরূপ-

- বর্ণ
- গভীরতা
- স্বচ্ছতা ও ঘোলাত্ব
- তাপমাত্রা এবং
- সূর্যালোক।

বর্ণ

পানির হালকা সবুজ বর্ণ পুকুরের অধিক উৎপাদনশীলতা নির্দেশ করে। পানিতে নাইট্রেটের পরিমাণ কম হলে পানির বর্ণ হলুদাভ হয়। ফসফরাসের পরিমাণ কমে গেলে পানি কালচে বর্ণ ধারণ করে। ধূসর বর্ণের পানিতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কম থাকে। কোন কোন উদ্ভিদ-প্ল্যাংকটনের আধিক্যের জন্য পানির বর্ণ মরচে লাল হয়, কিন্তু এগুলো মাছের খাদ্য নয়। নিচের সারণিতে পানির বর্ণের ওপর ভিত্তি করে মাছ চাষের উপযোগিতার ধারণা প্রদান করা হলো।

পানির বর্ণের ওপর ভিত্তি করে পোনা চাষে জলাশয়ের উপযোগিতার ধরন

পানির বর্ণ	প্রাকৃতিক খাদ্যের পরিমাণ ও প্রকৃতি	পোনা চাষে উপযোগিতা
স্বচ্ছ	উদ্ভিদ-প্লাংকটন নাই	ভাল নয়
সবুজাভ	পরিমাণমত উদ্ভিদ-প্লাংকটন আছে	ভাল
ঘন সবুজ	অতিরিক্ত উদ্ভিদ-প্লাংকটন আছে	ক্ষতিকর
বাদামী সবুজ	পরিমাণমত উদ্ভিদ ও প্রাণী-প্লাংকটন আছে	উত্তম
ধূসর সবুজ	অল্প উদ্ভিদ-প্লাংকটন ও ভাসমান পলিকণা বিদ্যমান	কম উপযোগী
মরচে লাল	মাছের খাদ্য নয় এমন উদ্ভিদ-প্লাংকটন বিদ্যমান	উপযোগী নয়।

গভীরতা

মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য প্লাংকটনের উৎপাদন ও সালোকসংশ্লেষণের জন্য সূর্যালোক অপরিহার্য্য। বিল নার্সারির গভীরতা বেশি হলে সূর্যালোক নির্দিষ্ট গভীরতা পর্যন্ড় পৌঁছাতে পারে না, এতে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন হয় না, ফলে পোনা মাছের বৃদ্ধি ব্যহত হয়। বিল নার্সারিতে গভীরতা কম হলে পানি গরম হয়ে যেতে পারে এবং তলদেশে ক্ষতিকর উদ্ভিদ জন্মাতে পারে। আবার পানির গভীরতা বেশি হলে বিল নার্সারির তলদেশে তাপমাত্রা কম থাকে,

অক্সিজেনের অভাব ঘটে এবং তলদেশে ক্ষতিকর গ্যাস সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় দুষণ এড়াতে তলদেশের মাছ ও অন্যান্য প্রাণী পানির উপরিভাগ চলে আসে।

- বিল নার্সারিতে পানির গভীরতা ১.০ মিটার থেকে ২.০ মিটার পর্যন্ড় হতে পারে।
- ১.৫ মিটার পানির গভীরতা পোনা চাষের জন্য উত্তম।

স্বচ্ছতা ও ঘোলাত্ব

বিল নার্সারিতে পানি ঘোলা হলে কার্যকর সূর্যালোক পানির নির্দিষ্ট গভীরতা পর্যন্ড় প্রবেশ করতে পারে না। ফলে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য অর্থাৎ উদ্ভিদ-প্লাংকটনের উৎপাদন কমে যায়। আবার পানির উপরের স্ড়রে অতিরিক্ত উদ্ভিদ-প্লাংকটনের উৎপাদনের ফলেও পানির স্বচ্ছতা কমতে পারে। পানির স্বচ্ছতা ২৫সেমি. হলে বিল নার্সারির উৎপাদন ক্ষমতা বেশি হয়। ঘোলা পানি মাছের খাদ্য চাহিদাকে প্রভাবিত করে। ঘোলা পানিতে দ্রবীভূত বিভিন্ন ধরনের ছোট ছোট কণা মাছের ফুলকায় আটকে থেকে ফুলকা বন্ধ করে দেয়। এতে মাছের শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। ফলে মাছের খাদ্য চাহিদা হ্রাস পায়।

- প্রতি শতকে ১.০-১.৫ কেজি হারে জিপসাম প্রয়োগ করে পানির ঘোলাত্ব দূর করা যায়।
- বিল নার্সারির কোনায় খড়ের ছোট ছোট আঁটি রেখে দিলেও এক্ষেত্রে ভালো ফল পাওয়া যায়।

তাপমাত্রা

মাছ শীতল রক্ত বিশিষ্ট প্রাণী হওয়ায় মাছের শরীরের তাপমাত্রা পানির তাপমাত্রার সাথে উঠানামা করে। মাছের বৃদ্ধির হার তাপমাত্রার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে তাপমাত্রা বাড়লে মাছের খাদ্য গ্রহণের প্রবণতাও বেড়ে যায়। আবার তাপমাত্রা কমে গেলে মাছের খাদ্য গ্রহণের হার হ্রাস পায় এবং মাছ মারা যেতে পারে। এজন্য শীতকালে বিল নার্সারিতে সার ও খাদ্যের পরিমাণ কিছুটা কমিয়ে দিতে হয়। তাপমাত্রা বেশি কমে গেলে মাছ খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেয়।

রুইজাতীয় পোনা মাছ চাষের জন্য অনুকূল তাপমাত্রা ২৫-৩০° সে.। কোন কারণে বিল নার্সারির পানির তাপমাত্রা বেড়ে গেলে বাইরে থেকে পরিস্কার ঠান্ডা পানি সরবরাহ করা যেতে পারে। টোপা পানা দ্বারা বিল নার্সারির পানির ১০ ভাগ আয়তন সাময়িকভাবে ছায়ার ব্যবস্থা করে বেশি তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

পানির রাসায়নিক গুণাগুণ

পানির রাসায়নিক গুণাবলী জলজ পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে। রাসায়নিক গুণাবলী পরীক্ষা করে পুকুরের উৎপাদনশীলতা ও পরিবেশ সম্পর্কে পানির তাপমাত্রার সাথে মাছের বৃদ্ধি সম্পর্ক সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। নিচে পানির বিভিন্ন রাসায়নিক গুণাগুণ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

দ্রবীভুত অক্সিজেন

অক্সিজেন প্রতিটি প্রাণীর জীবনের জন্য অত্যাবশ্যক। প্রয়োজনীয় পরিমাণ অক্সিজেন ছাড়া কোন প্রাণীর স্বাভাবিক বৃদ্ধি সম্ভব নয়। সে কারণের পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন মাছ চাষের জন্য অত্যন্ড় গুর ত্বপূর্ণ। সাধারণভাবে র ইজাতীয় মাছের পোনার অক্সিজেন চাহিদা বেশি। পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের উৎস দু'টি-

- পানি সংলগ্ন বাতাস এবং
- সবুজ শেওলা ও ডুবন্ড় জলজ-জীবের সালোকসংশে ষণ।

দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা পানির নিম্নোক্ত গুণাবলীর ওপর নির্ভর করে ঃ

- তাপমাত্রা।
- লবণাক্ততা এবং
- বায়ুমন্ডলের চাপ।

তাপমাত্রার সাথে অক্সিজেনের মাত্রার ব্যস্ড়ানুপাতিক (Reciprocal) সম্পর্ক রয়েছে। তাপমাত্রা বাড়লে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা কমে এবং তাপমাত্রা কমলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন কারণে পানিতে দ্রবীভুত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যেতে পারে। পানিতে দ্রবীভূত অ্ক্সিজেন কমে যাওয়ার প্রধান কারণগুরো নিম্নরূপ ঃ

- পানিতে বসবাসকারী জলজ জীবের শ্বাস-প্রশ্বাস।
- নার্সারির তলায় বিদ্যমান জৈব পদার্থেও পচন।
- তলায় অবস্থিত গ্যাসের বুদবুদের সাথে বায়ুমন্ড়লে অক্সিজেন চলে যাওয়া।
- ক্ষতিকর ব ম সৃষ্টি।
- মাটিতে গাছের পাতা ও ডালপালা পড়া।

- কাঁচা গোবর বেশি পরিমাণে ব্যবহার।
- আকাশ মেঘাছন্ন থাকা এবং
- পানি খুব ঘোলা হওয়া ।

পোনা চাষে অক্সিজেনের প্রভাব

পোনা মাছ চাষের জন্য পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের সর্বোত্তম মাত্রা হচ্ছে ৫-৮মিগ্রা/লিটার। পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ সহনশীল মাত্রার নিচে নেমে গেলে নিম্নরূপ লক্ষণগুলো পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

- পোনা মাছ পানির উপরে ভেসে উঠে ও খাবি খায়।
- চিংড়ি নার্সারির পাড়ের কাছে চলে আসে।
- মাছ ও চিংড়ি ক্লান্তিহীনভাবে ঘোরাফেরা করতে থাকে।

পানির রং অতিরিক্ত সবুজ হলে, তলায় খূব বেশি জৈব পদার্থ থাকলে, অধিক ঘনত্বে মাছ থাকলে বা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি পরিমাণ সার ও খাদ্য প্রয়োগ করা হলে উপরোক্ত অবস্থার সৃষ্টি হবার আশংকা থাকে। সাধারণতঃ মধ্যরাত থেকে ভোরের দিকে বা মেঘলা দিনে নার্সারিতে অক্সিজেন স্বল্পতা দেখা দেয়। নার্সারিতে অক্সিজেন পরিমাপ করার সময় তলদেশের পানিতে কী পরিমাণ অক্সিজেন দ্রবীভূত আছে তা বিবেচনায় আনতে হবে। সাময়িক অক্সিজেন ঘাটতি মোকাবেলার উপায়সমূহ ঃ

- পানির উপরিভাগে ঢেউ সৃষ্টি করে বা পানি আন্দোলিত করে।
- সাঁতার কেটে বা বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে বা হাত দিয়ে পানি ছিটিয়ে এবং
- পাম্প দিয়ে নতুন পানি সরবরাহ করে।

কার্বন ডাই-অক্সাইড

মাছ বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরির জন্য কার্বন ডাই-অক্সাইড অপরিহার্য। সালোকসংশেষণ প্রক্রিয়ার এটি একটি মৌলিক উপাদান। কার্বন ডাই-অক্সাইড ছাড়া সালোকসংশেষণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে পারে না। এরূপ অবস্থায় জলাশয়ের প্রাথমিক উৎপাদন (Primary production) ব্যাহত হয়। পুকুরের তলায় অত্যধিক জৈব পদার্থ ও কাদা থাকলে অধিক তাপমাত্রায় পুকুরে এ গ্যাসের আধিক্য ঘটে। পানিতে ২ নিযুতাংশ কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকলে মাছের উৎপাদন ভাল হয়।

কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস পানিতে তাড়াতাড়ি দ্রবীভূত হতে পারে। পানিতে এ গ্যাসটি মুক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড, বাইকার্বোনেট এবং কার্বনেট হিসেবে থাকতে পারে। পানিতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মূল উৎস হলো জৈব পদার্থের পচন এবং পানিতে অবস্থিত জলজ জীবের শ্বাস-প্রশ্বাস।

কার্বন ডাই-অক্সাইডের প্রভাব

পানিতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ হ্রাস পেলে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন হ্রাস পায়। এতে পোনা মাছের খাদ্য চাহিদা পূরণ হয় না। আবার কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ অত্যধিক বৃদ্ধি পেলে পানির অম্ত্বের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। ফলে প্রাথমিকভাবে প্রচুর প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হলেও মাছের খাদ্য গ্রহণের প্রবণতা ও চাহিদা হ্রাস পায়।

মুক্ত কার্বন-ডাই অক্সাইড সাধারণভাবে মাছ ও চিংড়ির জন্যে বিষাক্ত নয়। মাছ ও চিংড়ি কিছু সময়ের জন্য ৫০-৬০ মিগ্রা/লিটার পর্যন্ড় কার্বন ডাই-অক্সাইড সহ্য করতে পারে। এ গ্যাসের বিষাক্ততা পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের ঘনত্বের ওপর নির্ভর করে। অক্সিজেনের ঘনত্ব বেশি হলে কার্বন-ডাই অক্সাইডের বিষাক্ততা কম হয়। পানিতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা ১২ মিগ্রা/লিটারের বেশি হওয়া উচিত নয়। পানিতে এর পরিমাণ বেশি হলে মাছ ও চিংড়ি শ্বাস কষ্ট হয়ে থাকে।

নিম্নরূপে কার্বন ডাই-অক্সাইড নিয়ন্ত্রণ করা যায় ঃ

- মজুদ ঘনত্ব ও সার প্রয়োগ নিয়ন্ত্রণ এবং পুকুরে পানির গভীরতা কমিয়ে।
- নিয়মিত হররা টেনে এবং
- পানিতে ১.০ নিযুতাংশ হারে চুন প্রয়োগ করলে প্রায় ১.৫ নিযুতাংশ হারে কার্বন ডাই-অক্সাইড কমে যায়।

পানির পিএইচ

ঋনাত্মক হাইড্রোজেন আয়ন ঘনত্বের পরিমাপক-ই হলো পিএইচ। পিএইচ সংখ্যামান দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এর পরিমাপক শূন্য থেকে ১৪ পর্যন্ড় বিস্তৃত। পিএইচ-এর মাধ্যমে পানির অম্ত্ব ও ক্ষারত্বের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। এক্ষেত্রে ৭ নিরপেক্ষ মান, ৭ এর উপরে (৭-১৪) ক্ষারীয় মান এবং ৭ এর নিচে (৭-০) অম্ীয় মান নির্দেশ করে। অপেক্ষাকৃত ক্ষারধর্মী পানি (পিএইচ ৬.৫-৯.০) মাছচাষের জন্য ভাল। পানির পিএইচ মাছের খাদ্য চাহিদার ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। অম্ীয় পানি পোনা ও মাছচাষের জন্য ভাল নয়। পিএইচ মাত্রা ৭.০-৮.৫ এর মধ্যে থাকলে মাছের

খাদ্য চাহিদা বেশি ও উৎপাদন বেশি হয়। পানির পিএইচ মানের দ্রুত উঠানামা মাছ চাষের জন্য ভাল নয়। কারণ পানির পিএইচ মান কমে গেলে মাছের নিম্নবর্ণিত অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

- মাছের দেহ থেকে সোডিয়াম ও ক্লোরাইড বের হয়ে যায় ফলে এরা দুর্বল হয়ে মারা যায়।
- মাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও খাবার রুচি কমে যায়।
- নার্সারি জলাশয়ে খাদ্যের উৎপাদন হ্রাস পায়।

অন্যদিকে পানির পিএইচ মান বেড়ে গেলে মাছের নিম্নবর্ণিত অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে ঃ

- মাছের ফুলকা ও চোখ নষ্ট হয়ে যায়।
- অসমোরেগুলেশন ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং
- খাদ্য গ্রহণ বন্ধ হয়ে যায়।

পানির পিএইচ পরীক্ষা করার পদ্ধতি

নিম্নবর্ণিত পদ্ধতির মাধ্যমে পানির পিএইচ মাত্রা অনুমান করা যায় ঃ

- নার্সারির পানি মুখে দিলে টক বা লবণাক্ত স্বাদ লাগলে বুঝা যাবে পিএইচ ৭.০ এর কম।
- অম্লীয় পানিতে নীল লিটমাস কাগজ ভিজালে লাল হবে।
- পানির পিএইচ ৭.০ এর বেশি হলে পানি মুখে দিলে কষমুক্ত মনে হবে এবং
- ক্ষারীয় পানিতে লাল লিটমাস কাগজ ভিজালে নীল রঙ হবে।

পোনা মাছের নার্সারিতে শতাংশ প্রতি এক কেজি হারে চুন প্রয়োগ করে পিএইচ-এর মাত্রা বাড়ানো যায়। মাছচাষে পানির আদর্শ পিএইচ মাত্রা হচ্ছে ৭-৮.৫। পিএইচ-এর মান নিচে নেমে গেলে মাছ মারা যেতে পারে। সাধারণতঃ বর্ষাকালে পিএইচ যথাযথ মাত্রায় থাকে।

উপরোক্ত রাসায়নিক গুণাবলী ছাড়াও অ্যামোনিয়া, ফসফরাস, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন সালফাইড লবণাক্ততা ইত্যাদি পোনা মাছের উপযোগী পরিমিত মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। তা না হলে এসব রাসায়নিক পদার্থ নার্সারির পানির পরিবেশ নষ্ট করে পোনা উৎপাদন ব্যাহত করতে পারে।

পানির জৈবিক গুণাগুণ

বিল নার্সারি পুকুরের পানিতে স্বাভাবিকভাবে জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী জন্মায়। কিছু কিছু জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী অতি ক্ষুদ্র। এগুলো দেখতে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীকণা মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য। আবার

কিছু কিছু জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী পুকুরের পানি থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে স্বাভাবিক উৎপাদনশীলতা কমিয়ে দেয়। ফলে মাছ চাষে বিঘ্ন ঘটে। বিল নার্সারিতে নিম্নবর্ণিত জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী জন্মে থাকে।

ভাসমান উদ্ভিদ

এ ধরনের জলজ উদ্ভিদের পাতা পানির উপরে ভাসতে থাকে কিন্তু শিকড় পানির মধ্যে ঝুলে থাকে। যেমন-কচুরিপানা, টোপা পানা, ক্ষুদে পানা ইত্যাদি। এগুলো পুকুরে সূর্যালোক প্রবেশে বাধার সৃষ্টি করে এবং পুকুরে ব্যবহৃত সার হতে পুষ্টি গ্রহণ করে পুকুরের উৎপাদন ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। পুকুরে এ ধরনের উদ্ভিদ থাকলে সেগুলো উঠিয়ে ফেলতে হবে।

ডুবন্ড় উদ্ভিদ

এ ধরনের জলজ উদ্ভিদ পানির তলদেশে থাকে। এরা পুকুরের গভীরে সূর্যের আলো প্রবেশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। মাছের স্বাভাবিক চলাচলে বিঘ্ন ঘটায়। যেমন- পাতা ঝাঁঝি, কাঁটা ঝাঁঝি, নাজাস ইত্যাদি। পোনা চাষের নার্সারি হতে এসব উদ্ভিদ সরায়ে ফেলতে হবে।

নির্গমনশীল উদ্ভিদ

কিছু জলজ উদ্ভিদের শিকড় পুকুরের কিনারায় থাকে এবং উদ্ভিদগুলো পানির উপরে বাড়তে থাকে, এগুলো নির্গমনশীল উদ্ভিদ। যেমন-আড়াইল, দল, কলমিলতা ইত্যাদি। পোনা চাষের নার্সারি হতে এসব উদ্ভিদ সরায়ে ফেলতে হবে।

লতানো উদ্ভিদ

কিছু জলজ উদ্ভিদের শিকড় নার্সারি পুকুরের পানিতে ভাসমান থাকে এবং উদ্ভিদের শাখা প্রশাখাগুলো পানির উপরে ছড়িয়ে থাকে, এগুলো লতানো উদ্ভিদ। যথা- হেলেঞ্চা, মালঞ্চ, কেশরদাম ইত্যাদি। পোনা চাষের নার্সারি হতে এসব উদ্ভিদ সরায়ে ফেলতে হবে। প

প□াংকটন (Plankton)

পানিতে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব-কণা থাকে তাকেই প□াংকটন বলা হয়। প□াংকটন মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য। প□াংকটন বেশি থাকা পুকুরের অধিক উৎপাদনশীলতা নির্দেশ করে। প□াংকটন দু'ধরনের ক) উদ্ভিদ-প□াংকটন খ) প্রাণী-প□াংকটন ।

উদ্ভিদ-প□াংকটন (Phytoplankton)

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজ উদ্ভিদই উদ্ভিদ-প□াংকটন বা উদ্ভিদ-কণা। এগুলোর বর্ণ সবুজ। উদ্ভিদ-প□াংকটন মাছের খাদ্য শিকলের প্রথম পর্যায়ের প্রাকৃতিক খাদ্য। যেমন-ডায়াটম, ভলভক্স, স্পাইরোগাইরা ইত্যাদি। এগুলোকে সবুজ

শেওলাও বলা হয়। পুকুরে উদ্ভিদ-প□াংকটন অত্যধিক জন্মালে পানির উপর ঘন সবুজ স্ড়র পড়ে। একে ব□ুম বলে। এরূপ অবস্থা মাছের জন্য ক্ষতিকর। ঘন সবুজ স্ড়র পুকুরের পানিতে সূর্যের আলো প্রবেশে বাঁধার সৃষ্টি করে। জলাশয়ে পরিমিত উদ্ভিদ-প□্যাঙ্কটনের উপস্থিতি সফলভাবে মাছ চাষের জন্য অত্যাবশ্যক।

প্রাণী-প□াংকটন (Zooplankton)

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজ প্রাণীকে প্রাণী-প□াংকটন বা প্রাণীকণা বলা হয়। প্রাণী-প□াংকটন সাধারণতঃ বাদামী বর্ণের হয়ে থাকে। যেমন-ডেফনিয়া, রটিফেরা, ময়না ইত্যাদি। প্রাণী-প□াংকটন মাছের খাদ্য শিকলের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রাকৃতিক খাবার।

কীট-পতংগ

পুকুরের তলদেশে বিভিন্ন ধরনের কীট-পতঙ্গ বাস করে। এগুলো মাছের খাদ্য চক্রের অন্ড়র্ভুক্ত। যথা-বিভিন্ন লার্ভি, ওয়াটার বিটল। পানির উলি□খিত গুণাবলীসমূহ যথাযথ মাত্রায় সংরক্ষণ করা গেলে নার্সারি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সহজ হয়। ফলে অল্প ব্যয়ে কাঙ্ক্ষিত পোনা উৎপাদন করা যায়।

বিল নার্সারি পরিচালনা

বিল নার্সারিতে রেণু পোনা ছাড়ার পর দ্র"ত দৈহিক বৃদ্ধির মাধ্যমে সুস্থ সবল ধানী পোনায় পরিণত হয়। রেণু পোনার জন্য প্রয়োজন অল্প গভীরতা বিশিষ্ট জলাশয় এবং অধিক তদারকি। রেণূ পোনা বড় হওয়ার সাথে সাথে প্রয়োজন হয় বেশি জায়গার। পানির গভীরতার প্রভাব তখন কমে যায় এবং খাদ্যাভ্যাসেরও পরিবর্তন ঘটে। নার্সারি পুকুর ব্যবস্থাপনায় রেণু মজুদের কয়েকদিন পর পোনা কাটাই করলে অর্থাৎ মজুদ ঘনত্ব কমানোর জন্য এক পুকুর থেকে অন্য পুকুরে স্থানান্ড়রিত করলে বৃদ্ধির হার অনেক বেড়ে যায়। বিল নার্সারির ক্ষেত্রে বড় আকৃতির পোনা মজুদ করা উত্তম। সেজন্য দুই ধাপ পদ্ধতিতে পোনা উৎপাদন করতে পারলে ভাল। আমাদের দেশের চাষিরা র"ইজাতীয় মাছের চারা পোনা উৎপাদন এক ধাপ ও দুই ধাপ উভয় পদ্ধতিই অনুসরণ করে থাকে।

ক. একধাপ পদ্ধতি

একই পুকুরে যখন রেণু পোনা লালন পালন করে ঐ পুকুরেই চাহিদা মাফিক আকারের চারা পোনা তৈরি করা হয় তখন তাকে একধাপ পদ্ধতি বলা হয়। এক ধাপ পদ্ধতিতে সাধারণতঃ রেণু ছাড়ার

পর পোনা মাছ একই পুকুরে ২-৩ মাস পালন করে ৫-১০ সেমি আকার পর্যন্ড় প্রতিপালন করা হয়। এ পদ্ধতিতে রেণু মজুদের ঘনত্ব কম থাকে বলে তুলানমূলক লাভও কম হয়।

খ. দুই ধাপ পদ্ধতি

একটি পুকুরে বেশি পরিমাণে রেণু পোনা মজুদ করে প্রথমে ধানী পর্যন্ড় পোনা চাষ করা হয়। পরে ধানী পোনা অন্য পুকুরে স্থানান্ড়র করে চাহিদা মাফিক আকারের চারা পোনা তৈরি করা হয়। এ পদ্ধতির নার্সারি ব্যবস্থাপনায় দু'ধরনের পুকুর ব্যবহার করা হয় এবং তা'হলো আঁতুর পুকুর ও লালন পুকুর। আঁতুর পকুরে প্রাথমিকভাবে রেণু মজুদ করে ১০-১৫ দিন লালন পালন করা হয়। পরে লালন পুকুর বা অন্য পুকুরে স্থানান্ড়র করে সেখানেই ৭-১০ সেমি আকারের পোনা উৎপাদন করা হয়। সে সব নার্সারি চাষির একাধিক পুকুর আছে তারা এ পদ্ধতিতে সফলভাবে নার্সারি করে অধিক লাভজনক হতে পারেন। বিল নার্সারি কার্যক্রমটি যেহেতু সমাজভিত্তিক কার্যক্রম সেজন্য নার্সারি পদ্ধতি সাধারণতঃ নিম্নোলিখিত বিষয়গুলোর ওপর নির্ভর করে ঃ

- নার্সারি চাষি বা সুফলভোগীদের পোনা চাষের অভিজ্ঞতা।
- বিলে বা বিল পাড়ে পুকুর প্রাপ্তি বা তৈরির সুবিধা।
- সুফলভোগীদের আর্থিক সামর্থ্য।

নার্সারি ব্যবস্থাপনার সময়

বছরের কোন্ সময়ে নার্সারি কার্যক্রম শুর" করতে হবে তা'মূলত নির্ভর করে রেণু পোনা প্রাপ্তি ও পুকরে পানি পর্যাপ্ততার ওপর। বাংলাদেশে যে সকল মাছের প্রজাতির নার্সারি ব্যবস্থাপনা করা হয়, সে সমস্ড় মাছের রেণু প্রাকৃতিক উৎস হতে বা হ্যাচারি থেকে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে এবং মার্চ-এপ্রিল মাসেই এদের রেণু পাওয়া যায়। তবে মিরর কার্পের রেণু জানুয়ারি মাসেই পাওয়া যায়। সেজন্য মিরর কার্প ছাড়া অন্যান্য মাছের প্রজাতির পোনার নার্সারি মার্চ-এপ্রিল মাসেই শুর" করা হয়। প্রাকৃতিক উৎস ও হ্যাচারি উৎস হতে বিভিন্ন সময়ে রেণু প্রাপ্তির সময় নিম্নের সারণিতে দেখানো হলো। তবে উলে□খ যে, বিল নার্সারিতে কোনক্রমেই বিদেশী মাছের রেণু ছেড়ে পোনা উৎপাদন করা যাবে না। এসব বিদেশি মাছ বিলে অবমুক্ত করা হলে দেশীয় মাছের জীববৈচিত্রে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। বিশেষ করে তেলাপিয়া. গ্রাস কার্প, কার্পিও ইত্যদি বিদেশী মাছের বিল নার্সারি বা বিলে পোনা অবমুক্তকরণ কোনক্রমেই করা যাবে না।

প্রাকৃতিক ও হ্যাচারি উৎস হতে রেণু পোনা প্রাপ্তির সময়

প্রজাতি	রেণু প্রাপ্তির সময়	
	প্রাকৃতিক উৎস	হ্যাচারি উৎস
রুই, কাতলা, মৃগেল, কালি বাউস	এপ্রিল-জুন	মার্চ-আগস্ট
সিলভার কার্প	-	মার্চ-আগস্ট
কমন কার্প	জানুয়ারি- ফেব্রুয়ারী	জানুয়ারি-জুলাই
থাই সরপুঁটি	মে-জুন	মার্চ-আগস্ট

বিল নার্সারির অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার

রেণু পোনা মজুদের জন্য পুকুর বা জলাশয় নির্বাচন

বিল বা উন্মুক্ত জলাশয়ে একটু বড় আকারের পোনা অবমুক্তি করা প্রয়োজন। বড় আকৃতির পোনা উৎপাদন করতে হলে পোনাকে কম ঘনত্বে লালন-পালন করতে হবে। সেজন্য নার্সারি পুকুর হতে পোনা সরায়ে পোনার ঘনত্ব কমিয়ে দিতে হবে। বিভিন্ন বয়সে মাছের খাদ্য ও পরিবেশের তারতম্য রয়েছে। এ কারনে রেনু থেকে বড় পোনা উৎপাদন করার জন্য দুই ধরনের পুকুর প্রয়োজন। দু'ধরনের পুকরগুলো হলো- আঁতুর পুকুর ও লালান বা চারা পুকুর।

নার্সারি বা আঁতুর পুকুর

যে পুকুরে রেণু পোনা ছেড়ে ধানী পর্যান্ড় বড় করা হয় তাকে নার্সারি বা আঁতুর পুকুর বলে । আঁতুর পুকুরের গভীরতা কম হয়।

লালন বা চারা পুকুর

যে পুকুরে রেণু থেকে পোনা অর্থাঃ ধানী পোনা ছেড়ে চারা পোনা বা ফিংগারলিং (৫-১০ সেমি) পর্যন্ড় বড় করা হয় তাকে লালন বা চারা পুকুর বলে।

বিলের মধ্যে বা পার্শ্বে বিলের কোন গভীর অংশকে নার্সারি পুকুর হিসেবে ব্যবহার করা যায়। একান্ড়ভাবে যদি বিলে নার্সারি পুকুরের ব্যবস্থা না করা যায় তা'হলে বিলের পার্শ্বে বিভিন্ন ধরনের অগভীর বাৎসরিক পুকুর বা অন্যান্য পুকুরে শুস্ক মৌসুমে পানির ব্যবস্থা থাকে, এমন ধরনের পুকুরে মাছের পোনা উৎপাদন করা যায়। নার্সারি পুকুর এবং লালন পুকুরের বৈশিষ্ট্য হবে নিম্নরূপ ঃ

- পুকুরের পাড় মজবুত এবং কমপক্ষে ২-৩ মাস বন্যা মুক্ত হতে হবে।
- পুকুরে পর্যাপ্ত সূর্যের আলো এবং বাতাস লাগার ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- নার্সারি পুকুরে আয়তন হবে ১০-৫০ শতাংশ এবং পানির গড় গভীরতা হবে ১.০-১.৫ মিটার।
- লালন পুকুরের আয়তন ২০-১০০ শতাংশ এবং পানির গড় গভীরতা ১.৫-২.০ মিটার হলে ভাল হয়।
- আঁতুর ও লালন উভয় প্রকার পুকুর আয়তাকার হলে ব্যবস্থাপনায় সুবিধা হয় এবং
- পুকুরের তলায় যেন ১০-১৫ সেমি-এর বেশি কাদা না থাকে।

বিল নার্সারির কারিগরী ও প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাপনা

র"ইজাতীয় মাছের পোনাচাষ ব্যবস্থাপনায় রেণু থেকে ধানী এবং ধানী থেকে চারা পোনা উৎপাদন পর্যায় সমূহ তিন ধাপে বিভক্ত। যথা ঃ

- রেণূ পোনা মজুদ পূর্ব ব্যবস্থাপনা।
- রেণু পোনা মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা এবং
- মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা।

রেণু পোনা মজুদ পূর্ব কার্যক্রম

নার্সারি জলাশয় বা পুকুর রেণু পোনার বাসযোগ্য করে তৈরি করা এবং এদের বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধির হার বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ বা প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরির ব্যবস্থা করাই হচ্ছে রেণু পোনা মজুদ পূর্ব ব্যবস্থাপনা। প্রতিটি উৎপাদন চক্রের শুর"তেই রেণু পোনা ছাড়ার জন্য পুকুর প্রস্তুত করতে হবে। সঠিকভাবে পুকুর প্রস্তুত করলে মাছের জন্য অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। পুকুরের অনুকুল পরিবেশ বলতে বুঝায় ঃ

- পুকুরের পাড় এবং তলদেশ যথেষ্ট পরিমাণ পানি ধরে রাখার মত অবস্থায় বিরাজ করা।
- পুকুরের পানিতে কোন আবর্জনা বা অনাকাঙ্খিত জলজ উদ্ভিদ না থাকা।
- পুকুরটি অন্যান্য মাছ বা ক্ষতিকারক জলজ প্রাণী মুক্ত থাকা এবং
- পুকুরের পানিতে মাছের প্রাকৃতিক খাবার যথেষ্ট পরিমাণ বিদ্যামান থাকা।

নার্সারি পুকুরে রেণু পোনা মজুদের পূর্বে নিম্নলিখিত কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

১. নার্সারি পুকুর সংস্কার

নার্সারি ব্যবস্থাপনায় রেণু পোনা মজুদের পূর্বে নার্সারি পুকুর সংস্কার করা অত্যন্ড় জর"রী। রেণু পোনা চাষের জন্য পুকুর উত্তমরূপে প্রস্তুত করে নিতে হবে। জলাশয়ের প্রস্তুতি যত ভাল হবে, পোনা চাষের সাফল্যও তত নিশ্চিত হবে। পোনা চাষের উদ্দেশ্যে পুকুর সংস্কারের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কাজগুলো উত্তমরূপে সম্পন্ন করতে হবে-

- নার্সারি জলাশয় বা পুকুরের পাড় মেরামত।
- পাড়ের ঢাল মেরামত।
- তলায় অতিরিক্ত ও পচা কাদা অপসারণ।
- নার্সারি পুকুরের তলদেশ সমানকরণ।
- নার্সারির পুকুরের পানিতে ছায়া সৃষ্টিকারী পাড়ের বড় গাছের ডালপালা কেটে ফেলা ও পুকুর পাড়ের ঝোপঝাড় পরিস্কার করা।

১.১ নার্সারি পুকুরের পাড় মেরামত

- বিল নার্সারির জন্য পুকুরের পাড় বেশি উচু করার প্রয়োজন নাই। যদি শুধুমাত্র একই বিলে পোনা অবমুক্তির পরিকল্পনা থাকে তবে পাড় যেন স্বাভাবিক বর্ষায় ২-৩ মাস ডুবে না যায় এমন উচু হলেই চলবে।
- পাড় ভাঙ্গা থাকলে তা শক্ত করে বেঁধে দিতে হবে যাতে বাইরের রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ পুকুরে প্রবেশ করতে না পারে।
- পাড়ের গায়ে গর্ত থাকলে তা ভরে দিতে হবে যাতে পানি চুইয়ে পাড় ভেঙ্গে ফেলতে না পারে। তা'ছাড়া পানি যাওয়া আসা করলে পুকুরের উর্বরতা শক্তি হ্রাস পায়।

১.২ পাড়ের ঢাল মেরামত

- নার্সারি পুকুরের পাড়ের ঢাল ভাঙ্গা থাকলে বা ঢালের গায়ে গর্ত থাকলে তা মেরামত করতে হবে। তাহলে পাড় সহজে ভাঙ্গবে না
- পাড়ের ঢাল ২ঃ১ অনুপাতে রাখা দরকার। এতে পাড় ভেঙ্গে পড়বে না, জাল টানা সহজ হবে এবং সঠিকভাবে মাছ আহরণ করা যাবে। এছাড়া সূর্যের আলোর কার্যকরভাবে পুকুরের পানিতে পড়ায় প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন সহায়ক হবে।

১.৩ তলায় অতিরিক্ত ও পচা কাদা অপসারণ

নার্সারি পুকুরের তলায় ১০-১৫ সেমি.-এর বেশি কাদা থাকলে তা তুলে ফেলতে হবে। পুকুরের তলায় অতিরিক্ত জৈব পদার্থ থাকলে ঃ

- বিষাক্ত গ্যাস সৃষ্টি হতে পারে এবং তাতে পোনা মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- পোনার চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।
- সহজে হররা এবং জাল টানা যায় না।
- পুকুরের পানিতে অক্সিজেনের অভাব হতে পারে।

১.৪ নার্সারির পুকুরের তলদেশ সমানকরণ

পুকুরের তলদেশের গর্ত বা উঁচু-নিচু থাকলে সমান করে নিতে হবে। এতে জাল ও হররা টানা সহজ হয় এবং কার্যকরভাবে পোনা আহরণ সম্ভব হয়।

১.৫ নার্সারি পুকুরের পানিতে ছায়া সৃষ্টিকারী পাড়ের বড় গাছের ডালপালা কেটে ফেলা ও পুকুর পাড়ের ঝোপঝাড় পরিস্কার করা

- নার্সারি পুকুরের পাড়ে ছায়া সৃষ্টিকারী বড় গাছের ডাল-পালা কেটে ফেলতে হবে। এতে সূর্যের আলো সহজে ও কার্যকরভাবে পুকুরের পানিতে পড়বে যা প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনে সহায়ক হবে।
- পুকুরের পাড়ের ঝোপঝাড় কেটে পরিস্কার করতে হবে। এতে মৎস্যভূক প্রাণী সেখানে লুকিয়ে থাকতে পারবে না।
- পুকুর থেকে পুষ্টি শোষণ করে পুকুরের প্রাথমিক উৎপাদনশীলতায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারবে না।

২. জলজ আগাছা দমন

পানিতে বিদ্যমান বিভিন্ন ধরনের জলজ উদ্ভিদ, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মাছের পোনার উৎপাদনকে ক্ষতিগ্রস্ড়করে তাদেরকে জলজ আগাছা বলে। পুকুরে সাধারণতঃ ভাসমান, লতানো, নিমজ্জিত ও নির্গমনশীল জাতীয় বিভিন্ন আগাছা ও শেওলা দেখা যায়। সবধরনের জলজ আগাছা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মাছচাষে বেশ কিছু ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। মাছচাষের ওপর জলজ আগাছার উলে□খযোগ্য কিছু ক্ষতিকর প্রভাব হলো-

- জলজ আগাছা পুকুরের পানি ও মাটি হতে পুষ্টি গ্রহণ করে। ফলে পুকুরের প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা কমে যায়।
- পুকুরের পানিতে সূর্যালোক প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে ফলে সালোকসংশে□ষণে বাধাগ্রস্ড় হয়।
- পোনার সহজ চলাচলে ব্যাঘাত ঘটায়, ফলে সহজে রাক্ষুসে প্রাণীর শিকারে পরিণত হয়।
- জলজ আগাছা রাক্ষুসে বা শিকারী মাছ ও প্রাণীর আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে।
- নার্সারি পুকুরে সহজে হররা টানা যায় না।
- জাল টানায় অসুবিধা সৃষ্টি করে, ফলে পোনা টেকসইকরন, ধানী কাটাই ও পোনা আহরণে অসুবিধা হয়।

জলজ আগাছার এসব ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে পোনা মাছকে রক্ষা করার জন্য আাগাছাসমূহ অপসারণ একান্ড় প্রয়োজন। আগাছা অপাসরনের কাজটি কায়িক শ্রমের মাধ্যমে করাই ভাল। জলজ আগাছা, তন্ড় জাতীয় শেওলা দমন ও নীল শেওলা নিম্নলিখিতভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় ঃ

- কায়িক শ্রম দ্বারা সমস্ড় জলজ আগাছা পরিস্কার করাই উত্তম।
- তুঁত (কপার সালফেট) ৬-৮ গ্রাম/ শতাংশ/১ ফুট পানির গভীরতা হিসেবে পানিতে মিশিয়ে সমস্ড় পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে।
- তন্ড় জাতীয় শেওলা দমনের জন্য প্রতি শতাংশ ০.২৫ কেজি হারে চুন সন্ধ্যার পর ব্যবহার করা যেতে পারে অথবা
- অকিউট্রিন প□াস নামক রাসায়নিক পদার্থ ২.৫ গ্রাম/শতাংশ/১ ফুট পানির গভীরতা হারে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- এছাড়া বেশি পরিমানে ইউরিয়া ব্যবহার করে পানিকে ঘন সবুজ করলে তন্ড় জাতীয় শেওলা জন্মাতে পারে না। তবে পুকুরে পোনা মাছ থাকলে এটা না করাই শ্রেয়।

৩. রাক্ষুসে মাছ, প্রাণী ও অবাঞ্ছিত মাছ দুর করা

বিল নার্সারি হতে আগাছা দমনের পরবর্তী পদক্ষেপ হলো জলাশয় থেকে রাক্ষুসে মাছসহ অন্যান্য সব মাছ অপসারণ করা বা মারা। রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ নিম্নরূপ ক্ষতি করে থাকে ঃ

- রাক্ষুসে মাছ মাছের রেণু বা পোনাকে খেয়ে ফেলে।
- অবাঞ্ছিত মাছ মাছের রেণু বা পোনার খাবার খেয়ে ফেলে।
- অবাঞ্ছিত মাছ পোনা মাছের সাথে বাসস্থান ও অক্সিজেন নিয়ে প্রতিযোগিতা করে।
- রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত উভয় ধরনের মাছ নার্সারি পুকুরে রোগ জীবাণু বিস্ড়ার ঘটাতে পারে।

৩.১. নার্সারি পুকুর শুকানো

বিলের শুকনা অংশে নার্সারি স্থাপন করা হলে অথবা পুকুর শুকনা থাকলে উপরোক্ত আগাছা, অবাঞ্ছিত প্রাণী আপনা আপনি ধ্বংস হয়ে যায়। যদি নার্সারিতে পানি থাকে তবে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ অপসারণের উত্তম পদ্ধতি হলো পুকুর শুকানো। তাতে করে মাছসমূহ অপসারণের সাথে সাথে পুকুরের উৎপাদনশীলতাও বুদ্ধি পায়। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন নার্সারিতে রেণু মজুদের জন্য প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকলে জলাশয় না শুকানোই উত্তম। কেননা, বর্ষার পানি ব্যবহার করে বিল নার্সারি পরিচালনা করলে পোনা উৎপাদন দেরি হয়ে যাবে।

৩.২. ওষধ প্রয়োগ

পুকুর শুকানো সম্ভব না হলে ঔষধ প্রয়োগ করে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূর করা যায়। বিল নার্সারি হতে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূরীকরণের জন্য রোটেনন, চা বীজের খৈল বা তামাকের গুড়া ব্যবহার করা যেতে পারে। এ সকল জৈব পদার্থের ব্যবহারের কিছু বিশেষত্ব রয়েছে। যেমন ঃ

- রোটেনন, চা বীজের খৈল ও তামাকের গুড়া জৈব উৎস হতে উৎপন্ন।
- এসব ওষধ জৈব সার হিসেবেও কাজ করে।
- এগুলো প্রয়োগের ফলে মাছ মারা যায়, তবে চিংড়ি ও জলজ কীট মরে না।
- এসব ওষধ মাছের ফুলকায় আক্রমণ করে ফিলামেন্ট বন্ধ করে দেয়, ফলে দম বন্ধ হয়ে মাছ মারা যায়। এসব মৃত মাছ খাওয়া যায় এবং অস্বাস্থ্যকর নয়।

রোটেনন পাউডার ব্যবহার

রোটেনন হলো ডেরিস নামক গাছের শিকড় থেকে তৈরি এক ধরনের হালকা বাদামী রংয়ের পাউডার। রোটেনন ব্যবহারে মাছ মারা যায় কিন্তু চিংড়ি ও জলজ কীট মরে না। রোটেননের মাধ্যমে মৃত মাছ খাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে কপিপড জাতীয় ক্ষতিকর প্রাণী-কণা মারা যায়।

রোটেননের ব্যবহার মাত্রা

রোটেনন ব্যবহার মাত্রা নির্ভর করে রোটেননের শক্তির ওপর্। নিম্নে বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন রোটেননের প্রয়োগমাত্রা (প্রতি শতাংশে) দেওয়া হলো ঃ

রোটেননের কার্যকরী শক্তি (%)	সাধারণ পরিমাপক (গ্রাম/ফুট পানি)
৯.১	১৮-২০
৭	২০-২৫

নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলোর ওপর রোটেননের কার্যকারিত নির্ভর করে ঃ

- রোটেননের উৎপাদন কাল (গুদামজাতকরনের মেয়াদ)।
- কার্যকরী উপাদানের পরিমাণ।
- পানির তাপমাত্রা।
- পানির ঘোলাত্ব।
- রোটেননের প্রয়োগ পদ্ধতি।
- পুকুরের পানির গভীরতা।
- মাছের প্রজাতি।

নিম্নোক্ত সূত্র প্রয়েগ করে রোটেননের পরিমাণ নির্ণয় করা যায় ঃ

রোটেননের পরিমাণ (গ্রাম) =

পুকুরের দৈর্ঘ্য (ফুট) × প্রস্থ(ফুট) × পানির গভীরতা (ফুট) × রোটেননের মাত্রা × ০.০২৮৩

ব্যবহার পদ্ধতি

প্রয়োজনীয় পরিমাণ রোটেনন পাউডার বালতিতে নিয়ে আস্তে আস্তে পানি মিশিয়ে প্রথমে কাঁই তৈরি করতে হবে। প্রস্তুতকৃত কাঁই তিন ভাগে ভাগ করে তার এক ভাগ দ্বারা ছোট ছোট বল তৈরি করতে হবে। বাকি দুই ভাগ রোটেনন কোন পাত্রে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানির সাথে মিশিয়ে

তরলীকৃত করতে হবে। প্রথমে ছোট ছোট বলগুলো সমস্ড় পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে এবং পাশাপাশি তরলীকৃত মিশ্রণও পুকুরের পানিতে ছিটিয়ে দিতে হবে। রোটেনন ছিটানোর ২০-২৫ মিনিট পর মাছ আক্রান্ড় হওয়ার সাথে সাথে জাল টেনে মাছ ধরতে হবে। জাল টেনে পুকুরের পানি উলট পালট করে দিলে ঔষধের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। রৌদ্রোজ্জল দিনে রোটেনন প্রয়োগ করতে হবে। পুকুরের পানিতে সাধারণতঃ রোটেননের বিষক্রিয়ার মেয়াদ থাকে প্রায় ৭ দিন।

৪. চুন প্রয়োগ

চুন ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ অজৈব যৌগ যা এসিড মাধ্যমকে ক্ষারীয় বা নিরপেক্ষ করে। পুকুরে চূন প্রয়োগে নিম্নবর্ণিত উপকারিতা পাওয়া যায়।

- পুকুরের পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত ও নির্মল রাখার জন্য পুকুরে চুন প্রয়োগ করতে হয়।
- চুন মাটি ও পানির পিএইচ মাছচাষের উপযোগী রাখে। **চুন পানিকে নিরপেক্ষ রাখতে সহায়তা করে, ফলে প্লাংকটনের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজণীয় পরিবেশ বজায় থাকে। প্লাংকটনের বৃদ্ধির জন্য ক্যালসিয়াম ও গুরুত্বপূর্ণ আয়নসমূহ প্রদান করে থাকে।**
- পানিতে ক্ষারত্বের পরিমাণ ২০ মিগ্রা./লিটার-এর বেশি রাখতে সহায়তা করে।
- পুকুর প্রস্তুতকালীন চুন প্রয়োগের মাধ্যমে পরজীবী ও রোগজীবাণু দুর করে এবং বিভিন্ন রোগের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে।
- পুকুরের তলায় অবস্থিত জৈব পদার্থের পচন প্রক্রিয়া তরান্বিত করে মাটি ও পানিতে প্রয়োজনীয় পুষ্টি পদার্থের পর্যাপ্ততা সৃষ্টিতে সহায়তা করে।
- **সালোকসংশ্লেষণের জন্যে পানিতে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের সরবরাহ বাড়ায়।**
- চুনের ক্যালসিয়াম নিজেই একটি গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান। **ক্যালসিয়াম ও সিলিকা জীবের দৈহিক কাঠামো গঠনে সহায়তা করে থাকে।**
- চুন কাদায় আবদ্ধ ফসফরাস মুক্ত করে **প্লাংকটনের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।**
- **পানির ঘোলাত্ব দুর করে। ফলে সূর্যের কার্যকরী রশ্মি পানিতে প্রবেশে সুযোগ করে দেয়।**
- **সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে।**
- নার্সারির তলদেশের ক্ষতিকর গ্যাস দূর হয়।

চুনের ব্যবহার মাত্রা

জলাশয়ের পুকুরের তলদেশের মাটির প্রকারভেদ, জলাশয়ের বয়স এবং পানির পিএইচ-এর ওপর চুনের মাত্রা নির্ভর করে। এঁটেল ও কাদা মাটির জলাশয়ে চুন একটু বেশি লাগে। জলাশয় দীর্ঘদিন আগাছা ও পচা আবর্জনা থাকলে চুনের পরিমাণ বেশি লাগে। এসব কারণে চুন প্রয়োগের জন্য প্রথমেই জানা প্রয়োজন পানির পিএইচ ও ক্ষারত্বের পরিমাণ। পানির ক্ষারত্ব ও পিএইচ পরীক্ষা করার জন্য নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে।

ক. পানির গুণাগুন পরীক্ষার যন্ত্রঃ হ্যাক কিটের মাধ্যমে।

খ. রাসায়নিক পদ্ধতিঃ টাইট্রেশন পদ্ধতির মাধ্যমে।

গ. পিএইচ পেপার-এর মাধ্যমে।

ঘ. **সাবান দ্বারাঃ** ক্ষারত্ব ৪০ মিগ্রা/লি. এর বেশি হলে পানি খর হয়। খর পানিতে সহজে সাবানের ফেনা হয় না। আবার পানির ক্ষারত্ব ৪০ মিগ্রা/লি. এর কম হলে সে পানিকে মিঠা পানি বলে। মিঠা পানিতে সহজে প্রচুর পরিমাণে সাবানের ফেনা হয়।

ঙ. **পানের পিক দ্বারাঃ** পানিতে পানের পিক ফেললে যদি পিকের রং পরিবর্তন না হয় তা'হলে বুঝতে হবে যে পানির পিএইচ ৫-এর বেশি এবং পিকের রং যদি পরিবর্তন হয়ে কালচে হয় তা হলে পিএইচ ৫-এর কম। পুরাতন পুকুর, পতিত বা টলটলে পানিযুক্ত পকুরের ক্ষেত্রে এটা খুবই উপযোগী পদ্ধতি।

চ. **পানির রং দেখেঃ** অনেক ক্ষেত্রে অম্লীয় পানির রং কালচে বা তামাটে হয়ে থাকে।

হ্যাক কিট ও টাইট্রেশন পদ্ধতি সকল ক্ষেত্রে উপযোগী ও প্রযোজ্য নয়। অনেক ক্ষেত্রে প্রায় অসম্ভব। মাঠ পর্যায়ে বিল নার্সারির পানির পিএইচ ও খরতা নির্ণয়ের জন্য উপরে বর্ণিত অন্যান্য পদ্ধতি অনুসরণ করাই শ্রেয়।

চুনের প্রয়োগ মাত্রা ও ব্যবহার পদ্ধতি

সাধারণত: প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন ব্যবহার করা হয়। তবে মাটির পিএইচ ও চুনের ধরনের ওপর নির্ভর করেই চুনের মাত্রা নির্ধারণ করা উচিত। যখন শুধুমাত্র পিএইচ-কে বিবেচনা করে চুনের মাত্রা নির্ধারণ করা হয় সে ক্ষেত্রে চুন, পাথুরে চুনের চেয়ে দ্বিগুণ ও কলি চুন থেকে দেড়গুণ শক্তিশালী ধরে মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। নিম্নের সারণিতে মাটির প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন চুনের মাত্রার একটি নিদের্শনা দেয়া হলো।

মাটির প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন চুনের শতাংশ প্রতি মাত্রা

পিএইচ	পোড়া চুন	কলি চুন	পাথুরে চুন	ডলোমাইট

৩-৫	৬ কেজি	৯ কেজি	১২ কেজি	৯-১০ কেজি
৫-৬ (এঁটেল মাটি)	৪ কেজি	৬ কেজি	৮ কেজি	৬ কেজি
৬-৭ (দো-আঁশ মাটি)	১-২ কেজি	৩ কেজি	৪ কেজি	৬ কেজি

তা'ছাড়া মাটির প্রকৃতি অনুযায়ী নতুন ও পুরাতন পুকুরে বিভিন্ন চুনের মাত্রার আরো একটি নিদের্শনা নিম্নে দেয়া হলো।

মাটির প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন পুকরে পোড়া চুনের শতাংশ প্রতি ব্যবহার মাত্রা

মাটির ধরন	**নতুন পুকুর**	**পুরাতন পুকুর**
দো-আঁশ	১ কেজি	২ কেজি
এটেল	৪ কেজি	৬ কেজি

চুনের প্রয়োগ পদ্ধতি

শুকনো ও ভেজা মাটির বিলে নার্সারি প্রস্তুতকালীণ চুন গুড়া করে ঢালসহ সমস্ড় জায়গায় সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। বিল নার্সারি যদি পানি ভর্তি থাকে তবে চুন পানিতে ভিজিয়ে রেখে পরে পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে। এজন্য বালতি বা টিনের ড্রাম ব্যবহার করা যেতে পারে। কোন সুবিধাজনক পাত্র পাওয়া না গেলে নার্সারি পাড়ে কিংবা ভিতরে একটি গর্ত করে তা পানি দিয়ে ভর্তি করতে হবে। পরে এই পানি ভর্তি গর্তে চুনের টুকরাগুলো ভিজিয়ে রাখতে হবে এবং পরবর্তী সময়ে সমস্ড় পুকুরে সমনাভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।

চুন প্রয়োগের সময়

- বিল নার্সারি শুকনা তলায় চাষ দেয়ার ১-২ দিন পর।
- বিল নার্সারির পানি সেচের পর পরই ভেজা মাটিতে।
- বিল নার্সারিতে যদি পানি থাকে তাহলে সার প্রয়োগের ৬-৭ দিন আগে।

চুন প্রয়োগে সতর্কতা

- চুন গুলানো ও ছিটানোর সময় নাক মুখ গামছা দিয়ে বেঁধে নিতে হবে।
- কোন অবস্থাতেই প□াষ্টিকের পাত্রে চুন গুলানো যাবে না।
- চুনের পাত্রে পানি ঢালার আগে পাত্রের মূখ অবশ্যই চট বা বস্ড়া দিয়ে ঢাকতে হবে।

- পাত্রে চুন রেখে তারপর পানি ঢালতে হবে।
- বাতাসের অনুকূলে চুন ছিটাতে হবে।
- চোখে চুন লাগলে সাথে সাথে তা পরিস্কার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।

৫. **বিল নার্সারিতে পানি** ভরাট করণ

যদি পুকুর শুকানো হয় তা'হলে চুল প্রয়োগের ২-৩ দিন পর পুকুরে পানি সরবরাহ করতে হবে। পানি সরবরাহ কালে যেন কোন রাক্ষুসে মাছ এবং অবাঞ্ছিত ঢুকতে না পারে সেদিকে নজর রাখতে হবে। সবচেয়ে ভাল হয় যদি গভীর নলকূপ থেকে পানি প্রবেশ করা। যদি নদী বা খাল থেকে পানি প্রবেশ করানোর প্রয়োজন হয় তা'হলে পানির প্রবেশ পথে সুক্ষ কাপড় বা নেট দ্বারা পানি ছেকে পুকুরে প্রবেশ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. বিল নার্সারি পস্তুতকালীন সার প্রয়োগ

রেণু পোনার প্রাকৃতিক খাদ্য হলো প্রধানতঃ উদ্ভিদ-প□াংকটন ও প্রাণী-প□াংকটন। পুকুরে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য জন্মানোর জন্য সার প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগের ফলে পুকুরে অতি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ও প্রাণীজাতীয় জীবকণা জন্ম নেয় যা খেয়ে রেণু জীবন ধারন করে। এই সব উদ্ভিদ ও প্রাণীজাতীয় জীব-কণাগুলোকে বলা হয় প□াংকটন। পুকুরে দুই ধরনের সার ব্যবহার করতে হয়, যেমন-জৈব সার ও অজৈব সার।

পুকুরে সার প্রয়োগের ৩-৮ দিনের মধ্যে ফাইটোপ□াংকটন, ৫-১০ দিনের মদ্যে রটিফার, ৮-১৪ দিনের মধ্যে ক্লাডোসিরা এবং ১২-২০ দিনের মধ্যে কপিপডের উৎপাদন সর্বোচ্চ সীমায় থাকে। রেণুর জন্য যেহেতু রটিফারজাতীয় খাদ্য প্রয়োজন, তাই রেণু প্রাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ জেনে নার্সারি জলাশয়ে সার প্রয়োগ করলে পোনার উৎপাদন সবচেয়ে ভালো পাওয়া যাবে।

জৈব সার

জৈব সার সরাসরি প্রাণী-কণা এবং ব্যাকটেরিয়ার খাদ্য হিসাবে কাজ করে। তা'ছাড়া অজৈব পুষ্টি পানিতে মুক্ত করে উদ্ভিদ-কণা উৎপাদনকে সাহায্য করে। নার্সারি পুকুরে জৈব সার হিসাবে গোবর ব্যবহার করাই সবচেয়ে ভাল। তবে পুকুর প্রস্তুতি কালে কম্পোষ্ট ব্যবহার করা যেতে পারে।

অজৈব সার

প্রাথমিক ভাবে পুকুরে উদ্ভিদকণা (ফাইটোপ্লাংকটন) উৎপাদন করে, যা প্রাণীকণার (জুওপ্লাংকটন) খাদ্য। বিল নার্সারিতে ইউরিয়া ও টিএসপি অজৈব সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়। ইউরিয়া ও টিএসপি পানিতে নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের সরবরাহ করে থাকে।

জৈব ও অজৈব সারের ব্যবহার মাত্রা

পুকুরের নিজস্ব উৎপাদনশীলতার উপর সার প্রয়োগের মাত্রা পুকুর থেকে পুকুরে ভিন্ন হয়। পুকুর প্রস্তুতকালীন সার ব্যবহার মাত্রা নিম্নরূপ ঃ

পুকুর প্রস্তুতির সময় সারের প্রযোগ মাত্রা

গোবর সার	৫-৭ কেজি/শতাংশ
অথবা কম্পোষ্ট	৮-১০ কেজি/শতাংশ
ইউরিয়া	১০০-১৫০ গ্রাম/শতাংশ
টিএসপি	৫০-৭৫ গ্রাম/শতাংশ

নার্সারিতে সার হিসাবে সরিষার খৈলও ব্যবহার করা যেতে পারে। খৈল ব্যবহার করলে রেণুর জন্য প্রাণী-কণা প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। শতাংশ প্রতি ০.৫ কেজি সরিষার খৈল রটিফার (প্রাণীকণা) উৎপাদনে সহায়ক।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

- **শুকনা জলাশয়ে**

বিল নার্সারি বা শুকনা পুকুরে মোট জৈব সার সমানভাবে মাটিতে ছিটিয়ে মিশিয়ে দিতে হবে। জৈব সারের সাথে প্রতি শতাংশে ০.৫ কেজি হিসাবে সরিষার খৈল মিশিয়ে দেয়া যেতে পারে। অজৈব সার পুকুরে পানি ভরাটের পর একত্রে গুলে পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। নার্সারি পুকুরে পানি প্রবেশ করানোর পর অজৈব সার প্রয়োগ করতে হবে। একটি পাত্রের পানিতে টিএসপি সার ১০-১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে পুকুরে প্রয়োগের পূর্বে নির্দিষ্ট পরিমাণ ইউরিয়া সারের সাথে একত্রে গুলে সমস্ড় পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। অজৈব সার শুকনা পুকুরে প্রয়োগ করা উচিত নয়।

- **পানি ভর্তি পুকুরে**

নার্সারিতে পানি থাকলে টিএসপি ও গোবর সার একত্রে কোন পাত্রে তিন গুণ পানিতে ১২-২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। পুকুরে প্রয়োগের পূর্বে উক্ত মিশ্রণ ইউরিয়া সারের সাথে ভালভাবে মিশিয়ে রৌদ্রজ্জ্বল দিনে সমস্ড় পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।

সার প্রয়োগের সময়

বিল নার্সারি প্রস্তুত করার প্রক্রিয়ায় চুন দেয়ার ৫-৭ দিন পর অথবা রেণু ছাড়ার ৮-১০ দিন আগে সার প্রয়োগ করতে হবে। দিনের যে কোন সময় সার প্রয়োগ করা যায়। তবে, এ সময়টি সকাল থেকে দুপুরের মধ্যেই নির্ধারণ করা উচিত।

সার প্রয়োগের সতর্কতা

- **মেঘলা** দিন ও বৃষ্টির মধ্যে সার প্রয়োগের কার্যকারিতা কম হয়ে থাকে।
- ইউরিয়া সার বাতাসে খোলা অবস্থায় রাখলে কার্যকারিতা কমে যায়।
- অম্লীয় মাটিতে সারের কার্যকারিতা কম হয়।
- পানিতে জলজ উদ্ভিদ থাকলে সারের কার্যকারিতা কম হয়।
- চুন প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর এবং রেণু মজুদের ৮-১০ দিন আগে সার প্রয়োগ করতে হবে।

৭. পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্য পর্যবেক্ষণ

বিল নার্সারিতে রেণু বা ধানী মজুদের আগেই পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হয়েছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। রেণুর পুকুরে পানির রং লালচে সবুজ অথবা বাদামী সবুজ হলে ভাল। তাই প্রথমে খালি চোখে পানির রং ঠিক আছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। পানির রং ঠিক থাকলে পানিতে পরিমিত খাবার আছে কিনা তা নিচের পরীক্ষার মাধ্যমে দেখতে হবে।

- **সেকিডিস্ক এর মাধ্যমে প্রাকৃতিক খাদ্য পর্যবেক্ষণ**

  সেকিডিস্ক একটি লোহার চাকতি বিশেষ যা দেখতে থালার মত। এর ব্যাস সাধারণতঃ ২০ সেমি হয়ে থাকে। চাকতিটি সাদা ও কালো রং পাশাপাশি দিয়ে ৪ ভাগ করা হয়। চাকতিটি পানিতে ডুবিয়ে পানির স্বচ্ছতা পরিমাপ করে পানিতে বিদ্যমান মাছের প্রাকৃতিক খাদ্যের পরিমাপ করা হয়। লোহার চাকতিটি তিন

রংয়ের একটি সুতা দ্বারা ঝুলানো থাকে। চাকতির গোড়া থেকে সুতার প্রথম ২০ সেমি পর্যন্ড় লাল রং, দ্বিতীয় ১০ সেমি পর্যন্ড় সবুজ রং এবং হাতে ধরার সর্বশেষ অংশের রং সাদা হয়।

প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষার সময় ও পদ্ধতি

- পানির বর্ণ ঘন সবুজ হলে এবং উক্ত পানিতে লাল দাগ পর্যন্ড় সুতা ডুবানোর পর সেকিডিস্কের সাদা-কালো অংশ দেখা না গেলে বুঝতে হবে পুকুরে অতিরিক্ত খাবার আছে। এ অবস্থায় রেণু ছাড়া, সার এবং সম্পূরক খাবার ব্যবহার করা ঠিক নয়।
- সেকিডিস্কের সুতা সবুজ দাগ পর্যন্ড় পানিতে ডুবানোর পর চাকতির সাদা অংশ দেখা না গেলে বুঝতে হবে পানিতে পরিমিত খাবার আছে। এ অবস্থায় সার না দিয়েও পোনা ছাড়া যাবে।
- সবুজ দাগ পর্যন্ড় সুতা ডুবানোর পরও চাকতির সাদা অংশ দেখা গেলে বুঝতে হবে পানিতে খাবার কম আছে। এ অবস্থায় নার্সারিতে আরও সার দিতে হবে।
- সূর্য উঠার পর (সকাল ১০-১১ টায়) একই ব্যক্তি পুকুরের একই স্থানে সেকিডিস্ক ব্যবহার করবেন।

➢ হাত দ্বারা প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা

সেকিডিস্ক এর পরিবর্তে নিজের হাত কনুই পর্যন্ড় পুকুরের পানিতে ডুবানোর পর হাতের তালু/পাতা দেখতে হবে। যদি পুকুরের পানির রং সবুজাভ থাকে এবং হাতের তালু দেখা না যায় তাহলে বুঝতে হবে পুকুরে পরিমিত খাদ্য আছে। সূর্যালোকিত দিনে সকাল ১০-১১টায় এ পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। তবে ঘোলা পানিতে এর সঠিক ফলাফল আসবে না এবং ছোট হাত ব্যবহার করা যাবে না। তাছাড়া হাতের তালু ফর্সা হতে হবে এবং একই ব্যক্তিকে একই স্থানে প্রতিবার পরীক্ষা করতে হবে।

পুকুরে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য না থাকলে নার্সারিতে পুনরায় জৈব ও অজৈব সার প্রয়োগ করতে হবে। নার্সারিতে দ্রুত প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য শতাংশ প্রতি ৩০০-৪০০ গ্রাম সরিষার খৈল ও ৮০-১০০ গ্রাম ইউরিয়া ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনীয় সরিষার খৈল একটি পাত্রে তিনগুণ পানির সাথে ১২-২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে তার সাথে পরিমিত ইউরিয়া মিশিয়ে সকাল ১০-১১ টায় সারা পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে।

৮. পানি **বিষা**ক্ততা পরীক্ষা

বিল নার্সারিতে রেণু ছাড়ার ১-২ দিন আগে ওষধ দেওয়া পুকুরের পানিতে একটি হাপা টাঙ্গিয়ে বা একটি বালতি অথবা পাতিলে ১০-১৫টি পোনা ছেড়ে ২৪ ঘন্টা পর্যন্ড় পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যদি অধিকাংশ রেণু (৭০%) বেঁচে

থাকে তবে বুঝতে হবে পানিতে বিষাক্ততা নাই। যদি পোনা মারা না যায়, তবে বুঝতে হবে বিল নার্সারিতে রেণু ছাড়া যাবে। পোনা মারা গেলে পানি ঠিক না হওয়া পর্যন্ড় অপেক্ষা করতে হবে।

৯. বিল নার্সারির ক্ষতিকারক **পোকা-মাকড়** দমন

বিল নার্সারিতে সার প্রয়োগের পর পানিতে প্রাকৃতিক খাবার বৃদ্ধির সাথে রেণু পোনার ক্ষতি করে এমন অনেক ধরনের জলজ পোকা-মাকড় সৃষ্টি হয়। যেমন-হাঁস পোকা, ড্রাগন-ফ্লাই, বড় আকৃতির প্রাণী, ব্যাঙ্গাচি ও অন্যান্য জলজ প্রাণী জন্ম নেয়। এরা মাছের রেণু খেয়ে ফেলে বা মেরে ফেলে এবং খাদ্যের জন্য মাছের রেণুর সাথে প্রতিযোগিতা করে। ফলে রেণুর মড়ক বেশি হয়। তা'ছাড়া এ সকল পোকা-মাকড় থাকলে রেণুর খাদ্য উপযোগী কীটকে ধ্বংস করে এবং রেণু পোনা ধরে খায় বা পেট কেটে মেরে ফেলে। রেণু ছাড়ার আগে এবং পরে এদের নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক। ডিপটারেক্স বা সুমিথিয়ন এ ক্ষেত্রে অত্যন্ড় কার্যকর। যদি পানিতে কপিপড থাকে তা'হলে সুমিথিয়ন কার্যকরী নয়। ক্লাডোসেরা ও কপিপড পানিতে থাকলে রটিফার তৈরি হবে না। কেননা এরা রটিফারের খাদ্য কমিয়ে দেয় এমনকি রটিফারকে খেয়ে ফেলে, কপিপড রেণুও খেয়ে ফেলে। এটা গুর"ত্বপূর্ণ যে, র"ইজাতীয় সকল রেণুর প্রাকৃতিক খাদ্য রটিফার এবং বয়ঃবৃদ্ধির সাথে সাথে পোনা নিজ খাদ্যে অভ্যস্থ হতে থাকে।

- **ডিপাটারেক্স প্রয়োগ**

  রেণু ছাড়ার ২৪ ঘন্টা পূর্বে ৬-১২ গ্রাম/শতাংশ/১ ফুট পানির গভীরতা হিসেব করে নার্সারিতে ব্যবহার করলে হাঁস পোকা, ক্লাডোসেরা ও কপিপড সহজে মারা যায়। তবে রেণু পোনার খাদ্য রটিফার বেঁচে থাকে।

- **সুমিথিয়ন প্রয়োগ**

  রেণু ছাড়ার ১২-১৫ ঘন্টা পূর্বে পুকুরে ২-৩ মিলি/শতাংশ/১ ফুট পানির গভীরতা হিসেব করে সুমিথিয়ন ব্যবহার করলে হাঁস-পোকা সহজে মারা যায় এবং কপিপড ছাড়া অন্যান্য ক্ষতিকর জলজ পোকা মরে যাবে।

  প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য একটি পাত্রে ১০ লিটার পরিমাণ পানিতে গুলে সমস্ড় পুকুরে সমান ভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। কম তাপমাত্রা, মেঘ কিংবা বৃষ্টির সময় কীটনাশক ব্যবহার না করে দুপুর রোদে ব্যবহার করলে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়।

- **ডিজেল বা কেরোসিন প্রয়োগ**

  নার্সারিতে ডিজেল বা কেরোসিন প্রয়োগের মাধ্যমে রেণু পোনার ক্ষতিকর পোকা-মাকড় নিয়ন্ত্রন করা যায়। প্রতি শতাংশ জলাশয়ে ১২৫ মিলি লিটার বা প্রতি ১০ শতাংশ জলাশয়ে (গড়ে পানির গভীরতা ৩ ফুট) ১ লিটার হারে ডিজেল বা কেরোসিন প্রয়োগ করতে হবে।

নার্সারিতে রেণু ছাড়ার আগে পানিতে জাল বা হররা টানতে হবে। নার্সারি পুকুরে হররা টানলে নার্সারির তলায় জমে থাকায় বিষাক্ত গ্যাস তা দূর হয়ে যাবে। ডিপটারেক্স ব্যবহার করার ২৪ ঘন্টা পর নার্সারিতে রেণু ছাড়লে রেণুর প্রাকৃতিক খাদ্যের অভাব ঘটার সম্ভাবনা থাকে। সে জন্য রেণু মজুদের ৬-৭ দিন পূর্বে ডিপটারেক্স প্রয়োগ করলে নার্সারি পুকুরে রটিফার উৎপাদনের সুযোগ পাওয়া যায়। পরবর্তী সময়ে নার্সারি পুকুরে হাঁস পোকা জন্মে বিধায় রেণু ছাড়ার ২৪ ঘন্টা পূর্বে সুমিথিয়ন বা ডিজেল ব্যবহার করে রেণু পোনা ছাড়তে হবে। ডিজেল বালির সাথে মিশিয়ে ঝুর-ঝুরে করে সারা পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে।

রেণু পোনা মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা

রেণু পোনার মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ রেণু পোনার জাত নির্বাচন, গুণগত মান যাচাই, রেণুর ঘনত্ব নির্ধারণ, রেণু পরিবহন, রেণু পোনা শোধন ও অভ্যস্ড়করণ ইত্যাদি ধাপসমূহকে মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা বলে। রেণু পোনা এক ধাপ বা দুই ধাপ পদ্ধতিতে প্রতিপালন করা যায়। কোন্ পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে তা নির্ভর করে রেণু মজুদের পরিমাণের ওপর। রেণু পোনা মজুদের পরিমাণ আবার নির্ভর করে রেণু পোনার জাত, পুকুরের আয়তন ও তার উৎপাদনশীলতার ওপর। ছোট ও মাঝারি বিল নার্সারি অধিকতর উৎপাদনশীল বলে বিবেচিত। তবে, চাষির অভিজ্ঞতাও এক্ষেত্রে

বিশেষভাবে বিবেচ্য বিষয়। রেণু পোনা মজুদকালীন প্রতিটি ধাপই অত্যন্ড় যত্নের সাথে সম্পাদন করা প্রয়োজন। মজুদ ব্যবস্থাপনার পর্যায়ক্রমিক ধাপসমূহ নিম্নরূপ ঃ

- প্রজাতি নির্বাচন।
- মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণ।
- ভাল রেণু সনাক্তকরণ।
- রেণু পরিবহন।
- অভ্যস্থকরণ ও পুকুরে ছাড়া।
- বাঁচার হার পর্যবেক্ষণ।

প্রজাতি নির্বাচন

বিল নার্সারি কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে উন্নত মানের পোনা উৎপাদন করে সংশি□ষ্ট বিলে অবমুক্ত করা। সে কারণে নার্সারিতে কোন প্রজাতির পোনা উৎপাদন করা হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ড়ে আসার পূর্বে নিম্নোক্ত বিষয় বিবেচনা করতে হবে। যেমন ঃ

- যে বিলে পোনা অবমুক্ত করা হবে সে বিলে কোন প্রজাতির মাছ বেশি পাওয়া যায়।
- সংশি□ষ্ট বিলে কোন প্রজাতির মাছের চারা পোনার চাহিদা।
- নার্সারি পুকুরের ধরন।

উলি□খিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করে সংশি□ষ্ট বিলের চাহিদা অনুযায়ী রেণু পোনার প্রজাতি নির্বাচন করতে হবে। তবে প্রতিটি বিলের লাভজনক ব্যবস্থাপনা করতে হলে র"ইজাতীয় মাছের পাশাপাশি দেশীয় ছোট মাছের যেমনঃ কৈ, শিং, মাগুরসহ অন্যান্য মাছের পোনাও বিল নার্সারিতে মজুদ করা প্রয়োজন।

রেণু পোনা মজুদের পরিমাণ

রেণু পোনা মজুদের পরিমাণ নির্ভর করে মাছের প্রজাতি ও নার্সারির ধরন্। যদি একই পুকুরে চারা পোনা পর্যন্ড় চাষ করা হয় তাহলে মজুদ ঘনত্ব হবে কম আর যদি একধিক পুকরে ধাপে ধাপে চারা পোনা উৎপাদন করা হয় তা'হলে মজুদ ঘনত্ব হবে বেশি। পোনা চাষের ধরন ও মজুদ ঘনত্বের ওপর ভিত্তি করে চাষ পদ্ধতি দুই ধরনের।

ক. এক ধাপ পদ্ধতি

একই জলাশয়ে বা বিল নার্সারিতে ২-৩ মাস রেণু পোনা চাষ করে ৫-১০ সেন্টিমিটার আকার পর্যন্ড় প্রতিপালন করা হয়। এক ধাপ পদ্ধতিতে র“ইজাতীয় মাছের যে কোন প্রজাতির ৪-৫ দিন বয়সের রেণু পোনা প্রতি শতাংশে ৮-১০ গ্রাম হারে মজুদ করা হয়। এক ধাপ পদ্ধতিতে সঠিক ব্যবস্থাপনায় রেণু পোনা বাঁচার হার ৬০-৫০%।

খ. দুই ধাপ পদ্ধতি

দুই ধাপ পদ্ধতিতে পোনা উৎপাদনের একটি চক্রের জন্য একাধিক নার্সারি পুকুর ব্যবহৃত হয়। প্রস্তুতকৃত বিল নার্সারিতে ৪-৫ দিন বয়সের রেণু পোনা প্রতি শতাংশে ২৫-৩০ গ্রাম হারে মজুদ করা যায়। প্রথমে অপেক্ষাকৃত ছোট পুকুরে রেণু পোনা মজুদ করে ১০-১২ দিন পর্যন্ড় প্রতিপালন করা হয় এবং ১০-১২ দিন পর রেণু পোনা কিছুটা বড় (ধানী আকার) হলে উক্ত পোনাকে লালন পুকুরে স্থনান্ড়র করে ৬-৮ সপ্তাহ প্রতিপালন করে ৭-১২ সেন্টিমিটার আকারের চারা পোনা তৈরি করা যায়। এই দুই ধাপ পদ্ধতি তুলনামূলকভাবে অধিক লাভজনক। দ্বিতীয় পর্যায়ে সঠিক ব্যবস্থাপনায় ধানী পোনার বাঁচার হার শতকরা ৮০ ভাগ। প্রজাতি ভেদে মাছের রেণু পোনার আকৃতি বিভিন্ন হয়। সেজন্য প্রতি গ্রামে রেণু পোনার সংখ্যাও কম-বেশি হয়। গ্রাম প্রতি রেণুর সংখ্যা নিম্নের সারণিতে দেখানো হলো ঃ

প্রজাতি অনুযায়ী প্রতি গ্রামে রেনু পোনার সংখ্যা

প্রজাতি	রেণুর গড় সংখ্যা/ গ্রাম
কাতলা	৪০০
র“ই	৪৭৫
মৃগেল	৪০০
সিলভার কার্প	৩২৫
গ্রাস কার্প	৩২৫
মিরর কার্প	৪০০
বিগহেড	৩০০

নার্সারি পুকুরে রেণু পোনা মজুদের পরিমাণ নির্ভর করে মূলত নার্সারির ধরন ও মাছের প্রজাতির ওপর। মাছের প্রজাতি ভিত্তিক বিভিন্ন পদ্ধতিতে নার্সারি পরিচালনার ক্ষেত্রে যে পরিমাণ রেণু পোনা মজুদ করা প্রয়োজন তা নিম্নের সারণিতে দেয়া হলো ঃ

প্রজাতি ভিত্তিক রেণু পোনা মজুদের পরিমাণ

প্রজাতি	এক ধাপ পদ্ধতি	দুই ধাপ পদ্ধতি

সিলভার কার্প	১০ গ্রাম/শতাংশ	৩৫ গ্রাম/শতাংশ
কাতলা	১০ গ্রাম/শতাংশ	৩০ গ্রাম/শতাংশ
রুই	৮ গ্রাম/শতাংশ	২৫ গ্রাম/শতাংশ
মৃগেল	১০ গ্রাম/শতাংশ	৩০ গ্রাম/শতাংশ
গ্রাস কার্প	৮ গ্রাম/শতাংশ	২৫ গ্রাম/শতাংশ
বিগহেড	১০ গ্রাম/শতাংশ	৩৫ গ্রাম/শতাংশ

* নার্সারি পুকুরে একটি পুকুরে এক প্রজাতির রেণু মজুদ করা ভাল।

ভাল রেণু পোনা সনাক্তকরণ

আমাদের দেশে রেণু পোনা প্রাপ্তির দুইটি উৎস। তন্মধ্যে একটি হলো প্রাকৃতিক উৎস এবং অন্যটি হলো হ্যাচারি উৎস। প্রাকৃতিক উৎসে ব্রুড মাছের দেহের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশের পূর্ণ অনুকুল অবস্থায় প্রজনন ঘটে তাই রেণুর গুনগতমান অপেক্ষাকৃত ভাল। কিন্তু প্রাকৃতিক উৎস হতে সংগৃহীত রেণু পোনার প্রধান অসুবিধা হলো প্রয়োজনীয় সময়ে রেণু পাওয়ার অনিশ্চয়তা এবং প্রাকৃতিক উৎসের রেণুতে কাংক্ষিত ও অনাকাঙ্খিত বিভিন্ন মাছের রেণু পোনা মিশ্রিত থাকে।

পক্ষান্তরে, হ্যাচারিতে বিভিন্ন প্রজনন ট্যাংকে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির আলাদাভাবে প্রজনন ঘটানো হয় বা রেণু উৎপাদন করা হয় বিধায় রেণু পোনা সনাক্তকরণে কোন সমস্যা নেই। ফলে পছন্দ ও চাহিদামত প্রজাতির রেণু সংগ্রহ করা যায় এবং সরবরাহ তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল ও সহজলভ্য। কিন্তু হ্যাচারিতে ব্রুড মাছের গুনগত মান ও ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে করা না হলে রেণুর গুনগত মান খারাপ হতে পারে।

সব প্রজাতির রেণুর সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করে এদের গুণগতমান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। রেণু ক্রয়ের সময় অবশ্যই সে সকল বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করে রেণূর গুনগতমান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। রুইজাতীয় মাছের সুস্থ-সবল রেণু পোনার গুণগতমান নির্ধারণের জন্য কিছু পর্যবেক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য উলে□খ করা হলো ঃ

রুইজাতীয় মাছেল রেণুর গুণগত বৈশিষ্ট্য

পর্যবেক্ষণ বিষয়	ভাল রেণু	খারাপ রেণু

চলাফেরা	সন্ড়রনশীল	স্থির
দেহের রং	কালচে বাদামী	ফ্যাকাসে/সাদাটে
আচরণ ঃ ক. হঠাৎ পাত্রের গায়ে টোকা দিলে	লাফিয়ে উঠে বা রেণু দ্রুত সরে যায়	কোন সাড়া দেয় না বা রেণু ধীরে ধীরে সরে যায়
খ. পাত্রে পানিতে হাত দিলে	রেণু দ্রুত সরে পড়ে	রেণু ধীরে ধীরে সরে যায়
গ. গোলাকার পাত্রের পানিতে স্রোতের সৃষ্টি করলে	স্রোতের বিপরীতে সাতরাতে থাকে	**পাত্রের মাঝখানে জমা হয়ে থাকে**

রেণু পোনা পরিবহন

রেণু পোনা পরিবহন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রেণু পরিবহন যত ভাল হবে নার্সারি পুকুরে পোনার ছাড়ার সময় ওদের স্বাস্থ্য তত ভাল থাকবে ও পরবর্তীতে বাঁচার হারও তত বেশি হবে। বর্তমানে আমাদের দেশে সাধারণত আধুনিক পদ্ধতিতে পলিথিন ব্যাগে অক্সিজেনসহ রেণু পরিবহন করা হয়ে থাকে। **আধুনিক বা সনাতন যে পদ্ধতিতেই পরিবহন করা হোক না কেন রেণু পোনার পরিবহন ঘনত্ব মূলতঃ নির্ভর করে রেণুর অক্সিজেন চাহিদা এবং পরিবহন দুরত্বের ওপর। অক্সিজেনের চাহিদা নির্ভর করে পোনার প্রজাতি, ওজন, তাপমাত্রা এবং শারীরতত্ত্বের ওপর। সাধারণভাবে ৬০x৪০ বর্গ সেমি আকারের পলিথিন ব্যাগ রেণু পোনা পরিবহণে ব্যবহৃত হয়। পোনার আকারও পরিবহন দূরত্ব অনুযায়ী এরূপ একটি পলিথিন ব্যাগে পোনার সুপারিশকৃত পরিবহন ঘনত্ব নিম্নরূপ ঃ**

রুইজাতীয় রেণু পরিবহন ঘনত্ব

রেণুর ঘনত্ব/ব্যাগ (পলিথিন ব্যাগের আকার৬০x৪০ বর্গ সেমি.)	**পরিবহন দূরত্ব (ঘন্টা)**
১২৫-১৩০ গ্রাম	**১২-১৫**
২০০ গ্রাম	**৩-৪**

রেণু পোনা পরিবহনের পূর্বে পলিথিন ব্যাগে রেণু প্যাকিং এর পূর্বে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

- রেণূ পোনা প্যাকিং করার ২ ঘন্টা পূর্বে কৃত্রিম খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে এবং ধানী পোনা পরিবহনের পূর্বে টেকসই করে কমপক্ষে ২ ঘন্টা সীমিত জায়গায় অভূক্ত অবস্থায় রাখতে হবে।
- পোনা প্যাকিং এর পূর্বে পলিথিন ব্যাগে ছিদ্র আছে কিনা যাচাই করে নিতে হবে। ঝুঁকি এড়ানোর জন্য একটি পলিথিন ব্যাগ আরেকটি পলিথিন ব্যাগের ভিতরে নিয়ে পোনা পরিবহন করতে হবে।
- হ্যাচারি থেকে অক্সিজেনসহ পলিথিন ব্যাগে রেণু পরিবহন করতে হবে।

রেণু পরিবহনের সময় নিম্নলিখিত বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে ঃ

- পরিবহনকালে সর্বদা সর্তক থাকতে হবে যেন পলিথিন ব্যাগে কোন চাপ না লাগে। ব্যাগে যাতে কোন শক্ত বস্তুর আঘাত না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- রেণু পোনার ব্যাগ সব সময় ঠান্ডা ও ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে। প্রয়োজনে পলিথিন ব্যাগ ভেজা কাপড় বা চট দ্বারা ঢেকে রাখতে হবে।
- একসাথে বেশি ব্যাগ পরিবহন করা হলে বিকল্প অক্সিজেন সরবরাহ এবং অতিরিক্ত পলিথিন ব্যাগের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- পরিবহনকালে ব্যাগে রেণু মারা গেলে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি মৃত রেণু সরিয়ে ফেলতে হবে।

রেণু পোনাকে খাপ খাওয়ানো বা অভ্যস্ড়করণ এবং মজুদকরণ

রেণু পোনা পরিবহন করে আনার পর নার্সারিতে তাড়াহুড়া করে সরাসরি ছাড়া যাবে না। সরাসরি রেণু পোনা ছেড়ে দিলে মজুদের পর রেণু ব্যাপক হারে মারা যেতে পারে। সেজন্য রেণু পোনাকে নতুন পরিবেশের পানিতে সহনশীল বা অভ্যস্থকরে করে নার্সারিতে ছাড়তে হবে। রেণু পোনা পরিবহনের ব্যাগের পানির তাপমাত্রা ও বিল নার্সারির পানির তাপমাত্রা ভিন্ন ভিন্ন থাকে। সেজন্য রেণু ছাড়ার আগে নার্সারির পানির তাপমাত্রার সাথে খাপ-খাইয়ে নিতে হবে। রেণু পরিবহনকৃত পলিথিন ব্যাগের পানির তাপমাত্রা ও নার্সারির পানির তাপমাত্রা সমতা আনাই হচ্ছে পরিবেশ সহনশীলতা। পলিথিন ব্যাগের তাপমাত্রা ও বিল নার্সারির তাপমাত্রা একই মাত্রায় আনার জন্য নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে ঃ

- প্রথমে পলিথিন ব্যাগ ও পুকুরের পানির তাপমাত্রা সমতা এনে রেণু পোনা ছাড়তে হবে। এর জন্য রেণু পরিবহনকৃত ব্যাগটি ১০-১৫ মিনিট নার্সারির পানিতে ভাসিয়ে রাখতে হবে। পরে ব্যাগের মুখ আস্তে আস্তে খুলতে হবে।
- পরিবহন ব্যাগের মুখ খোলার পর হাত দ্বারা পরিবহন পাত্র এবং বিল নার্সারির পানির তাপমাত্রার ব্যবধান পরীক্ষা করতে হবে। এজন্য থার্মোমিটারও ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ব্যাগ ও পুকুরের পানির তাপমাত্রা সমান না হলে উভয় পানি বদলা বদলী করতে হবে। পানি বদলা বদলী করাতে তাপমাত্রার ব্যবধান ধীরে ধীরে কমে আসবে।
- রেণু ছাড়ার জায়গায় এবং এর আশে-পাশে হাত দিয়ে পুকুরের তলদেশের পানির উপরের দিকে আন্দোলিত করে নার্সারির পানির তাপমাত্রাও সমতা আনতে হবে।
- দুই পরিবেশের তাপমাত্রার পার্থক্য যেন ১-২° সে. এর বেশি না হয়।
- এ ভাবে পলিথিন ব্যাগ ও নার্সারির পানির তাপমাত্রা প্রায় সমান হলে পাত্রের মুখ কাৎ করে ধরে বাইরে থেকে পলিথিন ব্যাগের ভেতরের দিকে ঢেউ দিয়ে পানি ঢুকাতে হবে এবং তাতে স্রোতের সৃষ্টি হবে। এ অবস্থায় সুস্থ্য-সবল রেণু পোনা স্বেচ্ছায় স্রোতের বিপরীতে ধীরে ধীরে নার্সারিতে চলে যাবে।
- বিল নার্সারির পাড়ের কাছাকাছি বাতাসের প্রতিকুলে রেণু ছাড়তে হবে।

রেণু ছাড়ার সময়

- বিল নার্সারিতে সকাল অথবা বিকাল বেলায় রেণু ছাড়া ভাল। ঠান্ডা আবহাওয়া দিনের যে কোন সময়ে নার্সারিতে রেণু মজুদ করা যেতে পারে।
- মেঘলা আবহাওয়ায় দুপুরের পর বা ভ্যাপসা আবহাওয়ায়, বৃষ্টি অথবা নিম্ন চাপের দিনে বিল নার্সারিতে রেণু ছাড়া উচিত নয়।

রেণু ছাড়ার পর তিন দিন পর্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। পানি অধিক সবুজ ও শেওলাযুক্ত হলে রৌদ্রজ্জল দিনে পানিতে অধিক অক্সিজেনের সৃষ্টি হয় এবং অনেক সময় অতিরিক্ত অক্সিজেনে রেণু মারা যায়। এমতাবস্থায় পুকুরের তলার কাদা তুলে সারা পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে যেন পানি কিছুটা ঘোলা হয়। পানি ঘোলা করায় সূর্যের আলো পানিতে ঢুকতে বাঁধা প্রাপ্ত হবে। ফলে পানিতে অবস্থিত শেওলা সালোকসংশেষণ করে অধিক অক্সিজেন তৈরি করতে পারবে না এবং নার্সারির পানিতে বুদ বুদও সৃষ্টি করতে পারবে না।

রেণু পোনা মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থা

পুকুরে সার প্রয়োগের ফলে নার্সারিতে প্রাকৃতিক খাদ্য অর্থাৎ প□াংকটন জন্মে এবং রেণু বা বড় পোনা তা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। পোনা চাষের জন্য শুধু প্রাকৃতিক খাবারই যথেষ্ট নয়। তাই রেণু মজুদের পর প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি নিয়মিত সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ করা প্রয়োজন। তা'ছাড়া নার্সারিতে রেণু বেঁচে থাকা পর্যবেক্ষণ, নার্স্যারি পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য পর্যবেক্ষণ, পানি পরীক্ষা করা, নিয়মিত সার দেয়া, পোনার ঘনত্ব কমানো ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করতে হবে। রেণু মজুদের পর নিম্নোক্ত কাজগুলো সম্পন্ন করা অত্যন্ড় গুর ত্বপূর্ণ ঃ

- ❖ রেণুর বেঁচে থাকা পর্যবেক্ষণ।
- ❖ সম্পুরক খাদ্য প্রয়োগ।
- ❖ সার প্রয়োগ।
- ❖ ধানী পোনা কাটাই।

রেণুর বেঁচে থাকা পর্যবেক্ষণ

রেণু মজুদের পর এদের বাঁচার হার পরীক্ষার জন্য বাতাসের অনুকূলে বিল নার্সারির কিনারায় পানির উপরের স্ড়রে যে আবরণের সৃষ্টি হয় সেখানে খুব সুক্ষভাবে দেখলে অতি ক্ষুদ্রাকৃতির ভাসমান মৃত রেণু দেখা যায়। এসব মৃত রেণুর পরিমাণের ওপর নির্ভর করে রেণু বাঁচার হার অনুমিত করতে হবে। তা'ছাড়া রেণু মজুদের পর নার্সারি পুকুরে নিয়মিতভাবে রেণুর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে দেখতে হবে এবং সে কাজগুলো নিম্নরূপ ঃ

- ➢ প্রতিদিন ভোরে নার্সারি পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- ➢ রেণু সাধারণতঃ দল বেঁধে পুকুরের কিনার দিয়ে চলাফেরা করে, যা লক্ষ্য করলে খালি চোখেই দেখা যাবে।
- ➢ তা'ছাড়া গামছা বা পাতলা কাপড় পুকুরের কিনারার পানিতে টেনে দেখতে হবে। প্রতি টানে যদি ৫-১০ টি রেণু আসে তবে বুঝতে হবে রেণু পোনা বেঁচে থাকার হার ভাল।
- ➢ গামছা দিয়ে টানার পর রেণু থালায় নিয়ে দেখতে হবে। যদি রেণুগুলো সম্ভরণশীল হয় তবে বুঝতে হবে রেণু সুস্থ আছে। প্রথম কয়েক দিন রেণু দেখতে কালচে রং-এর ও পরে একটু বড় হলে দেখতে লালচে রংয়ের হয়।

উপরোক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও রেণু মজুদের পর নিম্নলিখিত দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে ঃ

- ➢ খুব সকালে রেণু ভেসে উঠতে পারে। তখন পানির ঝাপটা দিতে হবে, সম্ভব হলে পুকুরে নতুন পানি দিতে হবে।

- রেণু ছাড়ার কয়েকদিন পরে সকালে ও বিকালে হররা টেনে জলাশয়ের তলার বাজে বা বিষাক্ত গ্যাস বের করে দিতে হবে।
- রেণু ছাড়ার ৫-৭ দিনের মধ্যে নার্সারিতে চট জাল বা গুজরী জাল টানা যাবে না।
- মেঘলা দিনে সার ও খাবার দেয়া যাবে না।
- অধিক তাপমাত্রায় পুকুরের পানি গরম হয়ে গেলে ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে। সম্ভব হলে ঠান্ডা পানি সরবরাহ করতে হবে অথবা চট দিয়ে নার্সারির উপরে ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

নার্সারি ব্যবস্থাপনায় সম্পূরক খাদ্য নির্বাচন, খাদ্য মাত্রা নির্ণয় ও প্রয়োগ পদ্ধতি

বিল নার্সারিতে রেণুর খাদ্য ব্যবস্থাপনা

রেণু পোনার বেঁচে থাকা, দৈহিক বৃদ্ধি ও অন্যান্য জৈবিক কার্যাদি সম্পন্নের জন্য খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। প্রাকৃতিক খাবারের পাশাপাশি যে সব বাড়তি খাদ্য দেয়া হয় এদেরকে সম্পুরক খাবার বলে। স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য প্রাণীর মতই পোনার খাদ্যেও নির্দিষ্ট মাত্রার সকল পুষ্টি উপাদান

যেমনঃ আমিষ, শর্করা, স্নেহ, ভিটামিন ও খনিজ উপাদান থাকা প্রয়োজন। খাদ্যে এসব পুষ্টি উপাদান পরিমিত মাত্রায় না থাকলে পোনার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। নার্সারিতে অধিক ঘনত্বে পোনা চাষ করা হয় বিধায় রেণু বা পোনার দ্রুত বৃদ্ধির জন্য প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি বাহির হতে সম্পুরক খাদ্য সরবরাহ অত্যাবশ্যক। সম্পুরক খাদ্যের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

- সম্পুরক খাদ্য প্রয়োগ করে অধিক ঘনত্বে পোনা চাষ করা যায়।
- পোনা মৃত্যুর হার অনেকাংশে কমে যায়।
- অল্প জলাশয় হতে অধিক পোনা উৎপাদন করা যায়।
- অল্প সময়ে পোনা বিক্রয় উপযোগী হয়।
- পোনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
- সম্পুরক খাদ্য প্রয়োগ করে স্বজাতিভোজীতা রোধ করা যায়।

বিল নার্সারিতে খাদ্য প্রয়োগের হার পানির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাবলী ছাড়া বিল নার্সারির প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা, চাষ ব্যবস্থাপনা, খাদ্যের অবস্থা ও পুষ্টিমান ইত্যাদি বিষয়গুলোর ওপর নির্ভর করে। রেণু অবস্থায় খাদ্যের চাহিদা বেশি থাকে, সে কারণে রেণু মজুদের প্রথম দিকে বেশি মাত্রায় খাবার প্রয়োগ করতে হয়।

খাদ্য নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়

সম্পুরক খাদ্য প্রয়োগের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পোনার দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধি নিশ্চিত করা। নার্সারি পুকুরে খাদ্য নির্বাচনে খাদ্যের গ্রহণযোগ্যতা ও পুষ্টিমান অত্যন্ড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আবার খাদ্যের গ্রহণযোগ্যতা মাছের প্রজাতি, বয়স, খাদ্য কণার আকার, খাদ্যের প্রকৃতি, গন্ধ, স্বাদ ইত্যাদির ওপর। অন্যদিকে সকল প্রকার খাদ্য ব্যবহার সব প্রজাতির ক্ষেত্রে লাভজনক নয়। লাভজনকভাবে মাছের পোনা চাষের জন্য খাদ্য নির্বাচনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় উলেখ করা হলো ঃ

- খাদ্য উপাদানসমূহের সহজলভ্যতা।
- খাদ্য উপকরণের মূল্য ও চাষির আর্থিক সংগতি।
- পোনার পুষ্টি চাহিদা ও পোনা মাছের পছন্দ।
- খাদ্য উপকরণের পুষ্টিমান।
- খাদ্য পরিবর্তনের উচ্চ হার।

- খাদ্যে অবস্থিত পুষ্টি বিরোধী উপাদান।
- মাছের প্রজাতি ও পোনার বয়স।

খাদ্যের পুষ্টিমান নির্ধারণ

খাদ্য উপাদানের মধ্যে আমিষ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যয়বহুল। এজন্য মাছের খাদ্য তৈরির সময় আমিষের মাত্রা নির্ধারণে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। সহজ প্রাপ্য ও আর্থিক বিবেচনায় সাধারনতঃ সরিষার খৈল, চালের কুঁড়া, গমের ভূষি রেণুর খাবার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এ সব খাদ্যে আমিষের প্ররিমাণ কম। সেজন্য সরিষার খৈল ও ভুষির সাথে ফিস মিল বা কসাই খানার রক্ত ব্যবহার করা যায়। সরিষার খৈল (৩৫-৪০%), ভূষি (২০-২৫%) ও কসাই খানার রক্ত (৩৫-৪০%) মিশ্রনে তৈরি সম্পূরক খাদ্য পোনার জন্য অত্যন্ড় কার্যকর। এ মিশ্রন প্রয়োগে রেণু থেকে ধানী পর্যন্ড় বেঁচে থাকার হার শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ।

সম্পুরক খাদ্যের মাত্রা নির্ণয় ও প্রয়োগ পদ্ধতি

খাদ্য প্রয়োগ মাত্রা

নার্সারি পুকুরে খাদ্য প্রয়োগের হার পানির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাবলী ছাড়াও পুকুরের প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা, চাষ ব্যবস্থাপনা, খাদ্যের অবস্থা ও পুষ্টিমান ইত্যাদি ওপর নির্ভর করে। বড় মাছের চেয়ে ছোট অবস্থায় খাদ্য চাহিদা অনেক বেশি। সে কারণে নার্সারি পুকুরে প্রথম দিকে বেশি মাত্রার খাবার প্রয়োগ করতে হয়। সাধারণতঃ খাদ্যের পরিমাণ নির্ভর করে পুকুরের প্রাকৃতিক অবস্থা, রেণুর মোট ওজন, বয়স ও তাপমাত্রার ওপর। প্রথম দিকে রেণুর মোট ওজনের দ্বিগুণ হারে দৈনিক দুইবার খাবার দিতে হবে। নিম্নে রুইজাতীয় মাছের নার্সারি পুকুরে দৈনিক খাদ্য প্রয়োগের নমুনা মাত্রা উলে□খ করা হলো ঃ

নার্সারি পুকুরে সম্পূরক খাদ্যের পরিমাণ

রেণু মজুদের পর খাদ্য প্রয়োগ কাল (দিন)	খাদ্য প্রয়োগ হার
১-৫	মজুদকৃত ওজনের ২ গুণ/দিন
৬-১০	মজুদকৃত ওজনের ৩ গুণ/দিন
১১-১৫	মজুদকৃত ওজনের ৪ গুণ/দিন
১৬-২০	মজুদকৃত ওজনের ৫ গুণ/দিন

বিল নার্সারিতে রেণু মজুদের প্রথম ২ দিন পর্যন্ড় প্রতিদিন সকালে মজুদকৃত রেণু পোনার ওজনের দ্বিগুণ মিহি আটা পানিতে গুলে পাতলা করে নার্সারির চারিদিকে ছিটিয়ে দিতে হবে। পরবর্তী সময় থেকে ৮ দিন পর্যন্ড় নির্দিষ্ট পরিমাণ সরিষার খৈল (৫০%) ও মিহি কুড়া (৫০%) দ্বিগুণ পানির সাথে ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে পাতলা করে প্রতিদিন সকালে ও বিকালে নার্সারির চারিদিকে ছিটিয়ে দিতে হবে। তবে প্রথম ৫ দিন শুধুমাত্র খৈল প্রয়োগ সবচেয়ে ভাল। খৈল রেণু সরাসরি খেয়ে থাকে অবশিষ্টাংশ জৈব সার হিসেবে পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনে সহায়তা করে থাকে।

নার্সারি পুকুরে ১০-১৫ দিন পর রেণু পোনা বড় হয়ে ধানের মত আকৃতি হয় এবং এদেরকে তখন ধানী পোনা বলে। এ অবস্থায় পোনার খাদ্য প্রয়োগ হার ভিন্নতর হয়। অভিজ্ঞ নার্সারি চাষিগণ এ পর্যায়ে কিছু পোনা অন্য পুকুরে সরায়ে পোনার ঘনত্ব কমিয়ে দেয়। ধানী পোনা অন্যত্র সরিয়ে পোনার ঘনত্ব কমিয়ে দেয়াকে পোনা কাটাই বলা হয়। ধানী পোনা অন্য পুকুরে স্থানান্ড়র না করলে পোনার নমুনা সংগ্রহ করে নার্সারি পুকুরে পোনার মোট ওজন বের করে খাদ্য প্রযোগ মাত্রা নির্নয় করতে হবে।

খাদ্য উপকরণ ব্যবহার মাত্রা

নির্ধারিত পুষ্টিমানের আমিষ সমৃদ্ধ সম্পুরক খাদ্য তৈরির জন্য মূল্য, খাদ্য উপকরণের সহজলভ্যতা এবং চাষির আর্থিক সংগতি বিবেচনা করে বিভিন্ন ধরনের উপকরণ নির্বাচন এবং উপকরণসমূহের অনুপাত নির্ধারণ করতে হয়। নির্ধারিত অনুপাত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিমাণ উপকরণ পরিমাণ করে খাদ্যের মানকে আরও সুষম করার জন্য এর সাথে ০.৫ হতে ২% ভিটামিন ও খনিজ লবণ যোগ করা যায়। তৈরি খাদ্যকে পানিতে বেশি সময়ব্যাপি স্থিতিশীল রাখার জন্য বাইন্ডার হিসেবে আটা, ময়দা বা চিটাগুড় ব্যবহার করা যেতে পারে। নিম্নের সারণীতে বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করে র“ইজাতীয় মাছের পোনার প্রতি কেজি খাবারে বিভিন্ন খাদ্য উপকরণ ব্যবহারের বিভিন্ন নমুনা অনুযায়ী অনুপাত উলে□খ করা হলো ঃ

র“ইজাতীয় পোনার খাদ্য তৈরির জন্য খাদ্য উপকরণের অনুপাত

খাদ্য উপাদানের নাম	নমুনা-১		নমুনা-২		নমুনা-৩	
	ব্যবহার মাত্রা (%)	গ্রাম/কেজি খাদ্য	ব্যবহার মাত্রা (%)	গ্রাম/কেজি খাদ্য	ব্যবহার মাত্রা (%)	গ্রাম/কেজি খাদ্য

গমের ভূষি	-	-	-	-	২০	২০০
চালের কুড়া	৫০	৫০০	৪০	৪০০	২৫	২৫০
সরিসার খৈল	৫০	৫০০	৩০	৩০০	২৫	২৫০
ফিসমিল	-	-	২০	২০০	২০	২০০
আটা/চিটাগুড়	-	-	১০	১০০	১০	১০০
লবণ/ভিটামিন	-	-	-	-	-	-
মোট	**১০০**	**১০০০**	**১০০**	**১০০০**	**১০০**	**১০০০**

খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতি

রেণু মজুদের পর সরিষার খৈলে প্রথমে পানি দিয়ে উপর থেকে পানি ফেলে দিতে হবে। তাতে করে সরিষার খৈলের ক্ষতিকারক পদার্থ চলে যাবে। পরে সরিষার খৈল ১২-২৪ ঘন্টা পরিমাণ মত পানিতে ভিজিয়ে রেখে তার সাথে মিহি চালের কুড়া/গমের ভূষি ভালভাবে মিশিয়ে (৫০ঃ৫০) সমস্ড় পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। উলি□খিত খাদ্য একত্রে একটি পাত্রে অল্প পানির মধ্যে ভালভাবে মিশানোর পর সমস্ড় পুকরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হয়।

পরবর্তী সময়ে উপরে বর্ণিত খাদ্যের বিভিন্ন নমুনা ও পরিমাণ ধানী পোনা কাটাই না করা পর্যন্ড় দিতে হবে। ধানী পোনা কাটাই করার পর চারা পুকুরে সম্পুরক খাদ্য হিসেবে সাধারণতঃ কুড়া বা গমের ভুষি ও খৈল ব্যবহার করা যায়। অধিক উৎপাদনের জন্য এর সাথে আমিষ সমৃদ্ধ খাদ্য (গবাদি পশুর রক্ত বা ফিস মিল) দেয়া যেতে পারে। নার্সারি পুকুরে এসকল খাবার নির্দিষ্ট মাত্রায় ভিজিয়ে কাঁই করে সমস্ড় পুকুরে ছিটিয়ে দেয়া ভাল।

খাদ্য প্রয়োগের সময়

মাছ দিনের বেলা খাদ্য গ্রহন করে। তাই র"ইজাতীয় মাছের নার্সারিতে মোট খাবারের অর্ধেক সকাল ১০-১১ টায় একবার এবং বাকি অর্ধেক বিকেল ৩-৪ টায় আর একবার দেয়া উত্তম।

সবুজ খাদ্য প্রয়োগ

বিল নার্সারিতে কোন ক্রমেই গ্রাস কার্পের রেণু প্রতিপালন করা যাবে না। তবে সরপূটির রেণু মজুদ করা যেতে পারে। সরপুটির রেণু মজুদ করলে বড় হয়ে এরা ক্ষুদিপানা খাওয়া শুর" করলে

নিয়মিতভাবে ক্ষুদি পানা প্রয়োগ করতে হবে। ক্ষুদিপানার পরিমাণ মজুদকৃত সরপুটির রেণু পোনার মোট ওজনের ৪০-৫০% পর্যন্ড় হতে পারে। পুকুরে প্রয়োগের আগে ক্ষুদিপানা ভালভাবে ধুয়ে নিতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে যেন পুকুরে এদের বিস্ড়ার না ঘটে। পুকুরে বাঁশ বা অন্য কিছু দ্ধারা তৈরি চৌকোণাকার ভাসমান ফ্রেমের মধ্যে ক্ষুদিপানা দিতে হবে। ফ্রেমটি নার্সারি পুকুরের পাড়ের ১-২ মিটার দুরত্বে স্থাপন করতে হয়।

খাদ্য প্রয়োগে সতর্কতা

- র ইজাতীয় মাছের নার্সারিতে প্রয়োগকৃত সম্পুরক খাদ্য নির্দিষ্ট মাত্রায় ও পদ্ধতিতে প্রয়োগ করতে হবে।
- পোনার নমুনা সংগ্রহ করে প্রতি সপ্তাহে পোনার দৈহিক বৃদ্ধির পরিমাপ করতে হবে ও নার্সারি পুকুরের পোনার মোট ওজন পরিমাপ করতে হবে। মোট ওজনের নির্দিষ্ট অনুপাতে খাদ্যের প্রয়োগমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।
- পুকুরের পানি অতিরিক্ত সবুজ হলে খাদ্য প্রয়োগমাত্রা কমিয়ে দিতে হবে বা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হবে।
- সরিষার খৈলে পুষ্টি বিরোধী উপাদান গ কোনাইট থাকে যা পোনার বৃদ্ধি ব্যাহত করে। তাই সরিষার খৈল ১২-১৪ ঘন্টা ভিজিয়ে পানি ফেলে দিয়ে ব্যবহার করলে পুষ্টি বিরোধী উপাদানের কার্যকারীতা হ্রাস পায়।

।

নার্সারি পুকুরে মজুদ পরবতী সার প্রয়োগ ও পোনা কাটাই

রেণু মজুদের পর পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য সহনশীল মাত্রা বজায় রাখার জন্য প্রতিদিন নিমোক্ত হারে সার প্রয়োগ করতে হবে। গোবর ও টিএসপি সার একত্রে একটি পাত্রের মধ্যে দ্বিগুণ পানিতে ১২-২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। প্রয়োগের পূর্বে গোবর ও টিএসপি মিশ্রিত পানির সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ ইউরিয়া সার খুব ভালভাবে মিশিয়ে সূর্যালোকিত দিনের সকাল ১০-১১টায় পুকুরের পানিতে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। জৈব ও অজৈব সারের মাত্রা নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ

মজুদ পরবর্তী সার প্রয়োগ মাত্রা

সারের ধরন	প্রয়োগ মাত্রা (গ্রাম/শতাংশ)
গোবর অথবা	২০০-২৫০
কম্পোষ্ট	৩০০-৪০০
ইউরিয়া	৪-৫
টি.এস.পি	৩

সার প্রয়োগে সতর্কতা

- পানির রং অতিরিক্ত সবুজ হলে সাময়িকভাবে সার প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে।
- মেঘলা দিনে বা নিম্ন চাপের সময় সার প্রয়োগ অবশ্যই পরিহার করতে হবে।
- ইউরিয়া সার বাতাসে খোলা অবস্থায় রাখলে কার্যকারিতা কমে যায়।
- মিশ্র সার প্রয়োগের পূর্বে পানিতে ভালভাবে গুলে নিতে হবে।

ধানী পোনা কাটাই

যখন রেণু পোনা ধানের আকার বা ১.৫ -২ সেমি. এবং ওজনে প্রায় ১-২ গ্রাম হয় তখন তাদেরকে ধানী পোনা বলে । নিয়মিত সার ও খাবার দিলে ১০-১৫ দিনের মধ্যেই ধানী পোনা কাটাই বা স্থানান্ড়র উপযোগী হয়। এসময় ধানী পোনা কাটাই করে নার্সারি পুকুরে পোনার ঘনত্ব কমিয়ে দিলে অধিক উৎপাদন পাওয়া যায়। ধানী পোনা কাটাই করা হলে নিম্নোক্ত সুফল পাওয়া যায় ঃ

- পোনার প্রাকৃতিক খাদ্যের ঘাটতি দুর হয়।
- পোনার বাসস্থান সংকট দূর হয়।
- পানির পরিবেশ ভাল থাকে।
- পোনার দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে।
- পোনার বাঁচার হার বেশি হয়।

ধানী কাটাই পদ্ধতি

ধানী পোনা কাটাই করার আগের দিন চট জাল টেনে পোনাগুলোকে অল্প পানির ঝাপটা দিয়ে ছেড়ে দিতে হয়। পোনা কাটাইয়ের দিন সকালে জাল টেনে সতর্কতার সাথে পোনাগুলোকে একত্র করে বার বার পানির ঝাপটা দিতে হবে। জালের মধ্যে এমনভাবে স্রোতের সৃষ্টি করতে হবে যাতে পোনা

জালের কাপড়ের কাছে ভিড়তে না পারে। জাল টানার সময় জালের দুই পার্শ্বে বাহিরের দিকে পানির ঝাপটা দিতে হবে যাতে পোনা জালের সাথে ঘষা না খায়। জালের সাথে পোনা ঘষা খেলে পোনা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ধানী থেকে চারা পোনা উৎপাদন

ধানী পোনা বড় হয়ে হাতের আঙ্গুলের মতো বা আরো বড় আকার ধারণ করলে (৭ সেমি. এর উপর, ওজন ৫-২৫ গ্রাম) তাদেরকে চারা পোনা বলে। নার্সারি পুকুরের মতো লালন পুকুর ও একই নিয়মে তৈরি করা হয়। তবে লালন পুকুরে পোকা-মাকড় মারার জন্য কোন কীটনাশক ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। লালন পুকুরে ধানী পোনা মজুদের ঘনত্ব হবে নিম্নরূপঃ

- প্রতি শতাংশে ৮০০-১০০০টি (একক বা মিশ্র) ধানী পোনা মজুদ করা যায়।
- একই পুকুরে এক জাতের অথবা বিভিন্ন জাতের ধানী এক সাথে মজুদ করা যায়। তবে আলাদা আলাদা পুকুরে আলাদা আলাদা প্রজাতির ধানী মজুদ করা ভাল।
- পোনার মিশ্র চাষ করতে হলে এমন প্রজাতি নির্বাচন করতে হবে, যাতে খাদ্য ও বাসস্থানের কোন প্রতিযোগিতা না হয়। যেমন ঃ কাতলা ও বিগহেড-এর ধানী একই পুকুরে ছাড়া ভাল নয়।
- অল্প সময়ে বড় আকারের পোনা উৎপাদন করতে হলে কম ঘনত্বে ধানী মজুদ করতে হবে।

লালন পুকুরে বিভিন্ন প্রজাতির ধানী পোনা মজদ হার

শতাংশ প্রতি মজুদ ঘনত্ব (সংখ্যা)		
মাছের প্রজাতি	**পদ্ধতি-১**	**পদ্ধতি-২**
কাতলা	১৫০-২০০	-
সিলভার	২০০-২৫০	১৭৫-২০০
বিগহেড	-	১৫০-২০০
রুই	১৫০-২০০	১০০-১৫০
মৃগেল	১০০-১২৫	১৫০-২০০

কার্পিও	১০০-১২৫	১৫০-২০০
গ্রাস কার্প	১০০-১০০	৭৫-১০০
সর্বমোট	**৮০০-১০০০**	**৮০০-১০০০**

ধানী পোনা গননা পদ্ধতি

ছোট ছাকনিযুক্ত বাটি বা মগে পোনা ভর্তি করে অল্প পানিতে রেখে সাবধানে গুনতে হবে। এভাবে ৩-৪ বার গুনে তার গড় বের করে নিতে হবে। ঐ গড় সংখ্যাই হবে প্রতি বাটি বা মগের ধান পোনার পরিমাণ । পরবর্তীতে ঐ বাটি বা মগের মাধ্যমে সম্পূর্ণ পোনা গণনা করতে হবে।

ধানী পোনার জন্য সম্পুরক খাবার ও খাদ্য মাত্রা

নার্সারি পুকুরের জন্য বর্ণিত খাবার ধানী পোনার জন্য নিম্নোক্ত হারে প্রয়োগ করতে হবে। ধানী পোনার খাবার হার সাধারণতঃ দেহের ওজনের ১০-৫% ।

ধানী পোনার জন্য লালন পুকুরে খাদ্য প্রয়োগ হার

খাদ্য প্রয়োগ কাল (দিন-ধানী পোনা মজুদের পর হতে)	খাদ্য প্রয়োগ হার
১-১০ দিন	৪০-৪৫ গ্রাম/শতাংশ/ দিন
১১-২০ দিন	৮০-১০০ গ্রাম/শতাংশ/ দিন
২১-৩৫ দিন	২০০ গ্রাম/শতাংশ/ দিন

সরপুটির ধানী পোনা মজুদ করা হলে ক্ষুদিপানা নির্দিষ্ট জায়গায় দিতে হবে। পকুরে ক্ষুদি পানা দেয়ার আগে ১-২% লবন জলে ধুয়ে (না হলে ক্ষত রোগের বিস্ড়ার ঘটতে পারে) একটি ফ্রেমের খাঁচায় আবদ্ধ করে দিতে হবে।

বিলে পোনা অবমুক্তকরণ

পোনা প্রতিপালনের পর ৭-১০ সেমি আকারের হলে পোনা বিলে অবমুক্ত করার উপযোগী হয়। পোনার আকার যত বড় হবে তত তাড়াতাড়ি বিলে মাছের উৎপাদন পাওয়া যাবে। তা'ছাড়া বিলে মজুদের পর পোনার বাঁচার হারও বেশি হবে। বিল নার্সারির মাধ্যমে উৎপাদিত পোনা সংশি□ষ্ট বিলে বা বিলের অংশে বা বিলের পার্শ্ববর্তী কোন পুকুরে প্রতিপালন করা হয় বিধায় পোনা পরিবহনের তেমন কোন ঝুঁকি থাকে না। যদি বিলের কোন অংশে বিল নার্সারি স্থাপন করা হয় তা'হলে বর্ষা মৌসুমে বিল নার্সারিটি প□াবিত হলে পোনা নিজেরাই বিলে অবমুক্ত হতে পারবে। আর যদি প□াবিত হওয়ার পূর্বে পোনা অবমুক্ত করার প্রয়োজন হয় তা'হলে পোনা অবমুক্ত করার কয়েকদিন আগে নার্সারিতে জাল টানতে হবে যাতে পোনা কিছুটা টেকসই ও শক্ত হয়। পরে নার্সারি পুকুরের একপাড় কেটে দিলে পুকুরে পানি প্রবেশ করবে এবং ধীরে ধীরে পোনা বিলে অবমুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি নার্সারি বিলের অংশ না হয়ে পার্শ্বে কোন পুকুরে হয় তা'হলে পুকুরে পর পর একাধিক দিন জাল টেনে পোনাগুলোকে পানির ঝাপটা দিয়ে ছেড়ে দিয়ে পোনাগুলোকে শক্ত করতে হবে। পরে পোনা অবমুক্ত করার দিনে পোনাকে ধরে হাপা বা জালে কয়েক ঘন্টা রেখে দিয়ে পরে ড্রামে বা পাতিলে পোনা পরিবহন করা যেতে পারে। উলে□খ যে, বিলে পোনা অবমুক্ত করার পূর্বে নার্সারির পোনার পরিমাণ পরিমাপ করতে হবে।

বিল নার্সারির পরিচর্যা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

রেণু বা পোনার বাঁচার হার সম্পূর্ণরূপে পানির ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক গুণাবলীর ওপর নির্ভরশীল। পোনা মাছ চাষের নিমিত্ত সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পানির এসব গুণাগুণ মাছের অনুকূলে রাখতে হবে। নিম্নের জলজ পরিবেশের যে সব ভৌত রাসায়নিক ও জৈবিক গুণাগুনের প্রতিকূলতার কারণে মাছ মারা যায় অথবা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয় সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. বিল নার্সারিতে রাক্ষুসে মাছ ও অবাঞ্ছিত মাছের প্রবেশ।
২. বিল নার্সারিতে শামুক ও ঝিনুকের বিস্তার।
৩. নার্সারিতে প্রাকৃতিক খাদ্যের ঘাটতি।
৪. বিভিন্ন বয়সের পোনা একসাথে মজুদ।
৫. পোনার পুকুরে ঘন সবুজ পানি তথা সবুজ স্তর।
৬. বিল নার্সারির তলায় বিষাক্ত গ্যাস সৃষ্টি।
৭. পুকুরে সাপ-ব্যাঙের উপদ্রব।
৮. বিল নার্সারিতে ক্ষতিকর পোকা-মাকড়ের বিস্তার।
৯. কম গভীর নার্সারিতে উচ্চ তাপমাত্রা সৃষ্টি।
১০. জলজ আগাছার বিস্তার।
১১. রেণু মজুদের পর নিম্ন চাপের সৃষ্টি।
১২. অতিরিক্ত মজুদ ঘনত্ব।
১৩. নার্সারি পানির উপরে লাল স্তর।
১৪. পানিতে অক্সিজেনের অভাব।
১৫. অতিরিক্ত খাদ্য ও সার প্রয়োগ।
১৬. পানি দূর্গন্ধযুক্ত হলে।

উপরোক্ত কারণগুলোর মধ্যে **কয়েকটি বিশেষ কারণ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো ঃ**

১. নার্সারিতে রাক্ষুসে মাছ ও অবাঞ্ছিত মাছের প্রবেশ

বিল নার্সারি শুকনো অথবা বিষ প্রয়োগ করার পরও অনেক সময় নার্সারিতে রাক্ষুসে মাছ ও অবাঞ্ছিত মাছ থেকে যেতে পারে। এছাড়াও বাইরে থেকে শোল, টাকি, কৈ, শিং, মাগুর, চান্দা ও তেলাপিয়া ইত্যাদি মাছ বিল নার্সারিতে প্রবেশ করতে পারে। এতে মাছের উৎপাদন ৫০ থেকে ৯০ শতাংশ কমে যেতে পারে।

প্রতিকার ঃ

- পাখি, জাল, বৃষ্টির পানির স্রোত বা মানুষের মাধ্যমে এরা প্রবেশ করে। তাই এ সমস্ড় উৎস থেকে সতর্ক থাকতে হবে।
- বিল নার্সারিতে বাইরের পানি ঢুকতে দেয়া যাবে না।
- পুকুরের পাড় ব্যবহারের সময় সতর্কতা অবলম্বন করা।
- বাচ্চাদের নজরে রাখা, যাতে কোন কিছু নিয়ে আসতে না পারে।
- প্রযোজনে বিল নার্সারির চারিদিকে ৩০-৪০ সেমি. উঁচু বানা বা মশারীর জালের বেড়া দেয়া।

২. বিল নার্সারিতে শামুক ও ঝিনুকের বিস্ড়ার

বিল নার্সারি শুকানোর পরও শামুক-ঝিনুক বিস্ড়ার লাভ করতে পারে। এদের পরিমাণ অত্যধিক বেড়ে গেলে পানির রাসায়নিক গুণাগুণ এবং পোনার খাদ্যের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে। ফলে বিল নার্সারিতে পোনার উৎপাদন কম হয়।

প্রতিকার ঃ

নার্সারিতে মাছ থাকা অবস্থায় রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার না করাই ভাল। নার্সারিতে শুকনা পাতা, তালের পাতা, বাঁশের কঞ্চি বা অন্য আশ্রয়স্থল দিয়ে রাখলে শামুক-ঝিনুক এদের উপর বা সাথে আটকে থাকে। এ সমস্ড় উপকরণ মাঝে মাঝে পানির্ উপর তুলে শামুক-ঝিনুক অপসারণ করা যায়। নার্সারি শুকনা অবস্থায় বেশি মাত্রায় চুন প্রয়োগ করলেও শামুক-ঝিনুক কম হয়।

৩. প্রাকৃতিক খাদ্যের ঘাটতি

পোনা মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য প্রধানত প□াংকটন। নার্সারিতে এর ঘাটতি হলে মাছের বৃদ্ধি কমে যায়, এমনকি অনেক সময় পোনা মারা যায়। এছাড়াও প্রাকৃতিক খাদ্যের অভাবজনিত কারণে কোন কোন মাছের ক্ষেত্রে স্বভোজিতাও বেড়ে যেতে পারে।

প্রতিকার ঃ

পোনা চাষের উপযোগী পানির রং হচ্ছে হালকা বাদামী। সেকিডিস্কের মাত্রা ২০-৩০ সেমি, অবস্থা বজায় রাখার জন্য বিল নার্সারিতে নিয়মিত জৈব ও অজৈব সার প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়া প্রয়োজনীয় সম্পুরক খাদ্যের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

৪. বিভিন্ন আকারের পোনা মজুদ

একই পুকুরে বিভিন্ন বয়স ও আকারের রেণু বা ধানী পোনা মজুদ করা হলে প্রতিযোগিতায় ছোট পোনাগুলো টিকতে পারে না। এতে পোনার মৃত্যু হার বেড়ে যায়। তা'ছাড়া বিভিন্ন প্রজাতির মাছ একসাথে মজুদ করলেও খাদ্য এবং বাসস্থান নিয়ে প্রতিযোগিতা করে।

প্রতিকার ঃ

নার্সারি বা লালন পুকরে একই বয়স ও আকারের রেণু ও ধানী পোনা মজুদ করতে হবে। তা'ছাড়া একই প্রজাতির রেণু মজুদ করতে হবে।

৫. পানির ঘন সবুজ স্ড়র

অতিরিক্ত শেওলার জন্য পানির রং ঘন সবুজ হয়ে যায়। ফলে, রাতের বেলায় পানিতে অক্সিজেন কমে যায় এবং দিনে পিএইচ মান বেড়ে যায়। অতিরিক্ত অক্সিজেন স্বল্পতার কারণে ভোর রাতে মাছ পানির উপর ভেসে উঠে এবং বেশি সময় ধরে এ অবস্থা থাকলে মাছ মারা যায়।

প্রতিকার ঃ

তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা হিসেবে নার্সারিতে অগভীর নলক্কপের পরিস্কার ঠা"া পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা গেলে ভাল হয়। সেই সাথে নার্সারিতে খাদ্য ও সার প্রয়োগ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হবে। এছাড়া চারা পোনা আকৃতির কিছু সিলভার কার্পের পোনা ছেড়ে জৈবিকভাবে অতিরিক্ত উদ্ভিদ-প্লাংকটনের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৬. নার্সারির তলায় বিষাক্ত গ্যাস

অতিরিক্ত খাদ্য ও সার প্রয়োগের ফলে অথবা পুকুরের তলায় অধিক পরিমাণে পচা জৈব পদার্থ জমা হলে অ্যামোনিয়া ও হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। এ সমস্ড় গ্যাসের বিষক্রিয়ার কারণে মাছ মারা যেতে পারে।

প্রতিকার ঃ

মাছের ঘনত্ব কমিয়ে সাময়িকভাবে সার ও খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে এবং নিয়মিত হররা টেনে তলার মাটি উলট-পালট করে দিতে হবে।

৭. সাপ, ব্যাঙ ও গুই সাপের উপদ্রব

সাপ, ব্যাঙ ও গুই সাপ রেণু বা পোনা মাছের জন্য অত্যন্ড় ক্ষতিকর। এদের দ্বারা পুকুরের ৫০-৯০ শতাংশ মাছ মারা যেতে পারে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে একটি ব্যাঙ একদিনে ১০০-২০০ টি রেণু পোনা খেয়ে ফেলতে পারে।

প্রতিকার ঃ

সাপ, ব্যাঙ ও গুই সাপজাতীয় প্রাণী নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কায়িক শ্রমই সবচেয়ে ভাল। বাঁশের চাঁই, কোঁচ, ইত্যাদি দিয়ে সহজেই এগুলো মেরে ফেলা যায়। সাধারণভাবে ব্যাঙ যে সমস্ড় অঞ্চলে ডিম দেয় (পানি ও পাড়ের সংযোগ স্থলের ঘাস) সেসব এলাকার ঘাস বা আগাছা দূর করে ফেলতে হবে। বিল নার্সারির আশে-পাশে জঙ্গল থাকলে এসব ক্ষতিকর প্রাণীর উপদ্রব বেশি হয় বলে বিল নার্সারির চারপাশ আগাছা-জঙ্গল মুক্ত রাখতে হবে। এ ছাড়া বিল নার্সারির পাড়ে ঘন পুরাতন জাল দিয়ে এসব প্রাণীর প্রবেশ প্রতিরোধ করে অনেক উপকার পাওয়া যায়।

৮. ক্ষতিকর কীটের উপস্থিতি

রেণু বা পোনা ছাড়ার পর পানিতে কিছু বড় ধরনের কীট পতঙ্গের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যেমনঃ হাঁস-পোকা, কপিপোড শ্রেণির প্রাণী ইত্যাদি। এসব ক্ষতিকর পোকা-মাকড় রেণু খেয়ে ফেলে বা মেরে ফেলে এবং রেণু বা পোনার খাদ্য ধবংস করে।

প্রতিকার ঃ

চট জাল বা মশারীর জাল টেনে ক্ষতিকর কীট-পতঙ্গ ধরে মাটিতে পূঁতে ফেলতে হবে। জাল টানার পর এসব পোকা-মাকড় কেরোসিন বা ডিজেল দিয়েও মেরে ফেলা যায়। তবে রেণু মজুদের ৫-৭ দিনের মধ্যে চট জাল বা মশারীর জাল টানা ঠিক নয়।

৯. অগভীর বিল নার্সারির তাপমাত্রা বৃদ্ধি

রেণু বা পোনার তাপের সহনশীলতার মাত্রা খুব একটা বিস্ড়ৃত নয়। সে কারণে দিনের তাপমাত্রা হঠাৎ করে বেড়ে গেলে কম গভীর বিল নার্সারিতে মজুদকৃত পোনার উপর পারিবেশিক প্রতিকূলতা দেখা দেয়ার এরা মারা যেতে পারে।

প্রতিকার ঃ

সম্ভব হলে নার্সারিতে ঠান্ডা পানি প্রবেশের ব্যবস্থা করা। তাপমাত্রা বেশি হলে নার্সারির উপর মোটা কাপড় বা চট দিয়ে ছাউনী নির্মাণ করা যেতে পারে।

১০. জলজ আগাছার বিস্ড়র

পানিতে জলজ আগাছার বিস্ড়র লাভ করলে রেণু বা পোনার প্রাকৃতিক খাদ্য কমে যায়। ক্ষতিকর কীট-পতঙ্গ বিস্ড়র লাভ করে এবং শেওলাজাতীয় জলজ আগাছার বিস্ড়রে পিএইচ বেড়ে যায়। এসব বিষয় অনেক সময় পোনার মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

প্রতিকার ঃ

নিয়মিত নার্সারির জলজ আগাছা অপসারণ করতে হবে।

পোনা চাষে রোগ ও মাছর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

রোগ হচ্ছে যে কোন প্রাণীর দেহের অস্বাভাবিক অবস্থা- যা বিশেষ কোন লক্ষণ দ্বারা প্রকাশ পায়। রোগ ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত অজ্ঞতা বা অবহেলার কারণে প্রতি বছরই অনেক নার্সারিতে ব্যাপক হারে পোনা মাছ মারা যায়। ফলে, চাষি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ড় হয়ে পড়তে দেখা যায়। বিল নার্সারিতেও এর ব্যতিক্রম হয় না।

রোগের কারণ

জলজ পরিবেশের চাপ, রোগ-জীবাণু এবং মাছের আভ্যন্ড়রীণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে। সেজন্য মাছের রোগাক্রান্ড় হওয়ার পিছনে একাধিক কারণ বা বিষয় কাজ করে। এখন পর্যন্ড় যেসব কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে তাদের মধ্যে উলে□খযোগ্য হচ্ছে-

- ❖ পানির ভৌত-রাসায়নিক গুণাগুণের অবনতি (পানির তাপমাত্রা, পচা জৈব পদার্থ, পিএইচ, দ্রবীভূত অক্সিজেন, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন সালফাইড ইত্যদি)।
- ❖ প্রযোজনের অতিরিক্ত সার ও খাদ্য প্রযোগ।
- ❖ বাইরে থেকে ময়লা ধোয়া দূষিত পানির প্রবেশ।
- ❖ অধিক মজুদ ঘনত্ব।
- ❖ প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাব।
- ❖ রেণু বা পোনার ত্র“টিপূর্ণ পরিবহন ও হ্যা“লিং।
- ❖ পরজীবি ও রোগ-জীবাণূর সংক্রমণ।

পোনা মাছ রোগাক্রান্ড় হওয়ার কয়েকটি গুর“ত্বপূর্ণ কারণ নিম্নরূপ ঃ

- ❖ পুষ্টিহীনতাজনিত রোগের কারণসমূহ হলো-
  - ➢ প্রাকৃতিক খাদ্যের অভাব।
  - ➢ সম্পুরক খাদ্যের অভাব।
  - ➢ সুষম খাদ্যের অভাব।
- ❖ সংক্রমণজাতীয় রোগের কারণ হলো-
  - ➢ অনুজীব।
  - ➢ পরজীবী।

- ➢ এককোষী প্রাণী।
- ➢ ছত্রাক।
- ➢ ব্যাকটেরিয়া।
- ➢ ভাইরাস।

❖ পরিবেশ দূষণ জাতীয় রোগের কারণ হলো-

- ➢ অক্সিজেনের অভাব বা বেশি।
- ➢ অ্যামোনিয়া বা হাইড্রোজেন সালফাইডের আধিক্য।
- ➢ জৈব তলানী।
- ➢ পিএইচ এর কম-বেশি।
- ➢ বিষাক্ত গ্যাস।

❖ ব্যবস্থাপনায় ত্রুটিজাতীয় রোগের কারণ হলো-

- ➢ আঘাতপ্রাপ্ত পোনা।
- ➢ ত্রুটিপূর্ণ পরিবহন।
- ➢ অতিরিক্ত মজুদ ঘনত্ব।
- ➢ অপ্রস্তুত বিল নার্সারি।

রোগের সাধারণ লক্ষণ

রোগের প্রকারভেদ ও রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণূ ও পরজীবীর আক্রমনের ধরণ অনুযায়ী রোগাক্রান্ড় পোনার মধ্যে বিভিন্ন প্রকার লক্ষণ দেখা দেয়। সাধারণত রোগাক্রান্ড় পোনার মধ্যে যে সমস্ড় লক্ষণ ও আচরণ বেশি দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে ঃ

- পোনা ঠিকমত খাদ্য গ্রহণ করে না।
- পোনা ধীর গতিতে চলাচল করে।
- পোনা এলোমেলোভাবে পানির উপর সাঁতার কাটতে থাকে।
- পাড়ের কাছাকাছি খাবি খায় আবার কখনও পাড়ে উঠে আসে।
- ফুলকায় কালো দাগ দেখা যায়।
- পোনার লেজ ও পাখনায় পচন দেখা যায়।
- শরীরে ক্ষত দেখা যায়।

মাছের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

আমাদের দেশে পোনাচাষির আর্থ-সামাজিক অবস্থা, উপকরণের সহজ প্রাপ্যতা ও চিকিৎসা পদ্ধতির জটিলতার কারণে মাছের রোগ চিকিৎসা চাষিদের পক্ষে শুধুমাত্র কষ্টসাধ্যই নয়, অনেকটা অসম্ভবও বটে। এ জন্য মনে রাখা দরকার রোগের চিকিৎসার চেয়ে রোগ প্রতিরোধই অধিক শ্রেয়। রোগ হওয়ার পূর্বে বা রোগের শুরুতেই নিচের পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করলে মাছের রোগের চিকিৎসার মত ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় পরিহার করা যেতে পারে।

- নার্সারিতে পরিমিত সূর্যালোকের ব্যবস্থা করা।
- নার্সারি শুকিয়ে নিয়মিত চুন দেয়া।
- কোন অবস্থাতেই অতিরিক্ত রেণু মজুদ না করা।
- বাইরের অবঞ্চিত প্রাণী ও পানি বিল নার্সারিতে ঢুকতে না দেয়া।
- তলায় অতিরিক্ত কাদা না রাখা।
- পরিমিত সার ও খাদ্য সরবরাহ রাখা।
- নার্সারিতে ঘন ঘন জাল না ফেলা।
- নার্সারির পানি ঘোল করার উৎস বন্ধ করা।

মাছের রোগের প্রতিকার

পোনার পুকুরে সাধারণত ফুলকা পচা, লেজ ও পাখনা পচা, বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া ও এককোষী বাহ্যিক পরজীবী রোগের বিস্তার ঘটে।

- ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগের জন্য পুকুরে ১-২ গ্রাম/শতাংশ/১ ফুট পানির গভীরতার হিসাবে পুকুরে মেলাকাইট গ্রীন ব্যবহার করা যায়। সাধারণত শতাংশ প্রতি ১ কেজি চুন ব্যবহার করে মাটি ও পানিকে জীবাণুমুক্ত রাখা যেতে পারে।
- লেজ ও পাখনা পচা রোগের জন্য কপার সালফেট ৬-৮ গ্রাম/শতাংশ/১ ফুট পানির গভীরতা হারে পুকুরের পানিতে ব্যবহার করতে হবে। ৭ দিন পর ২৪-২৫ গ্রাম/শতাংশ/১ ফুট পানির গভীরতা হিসাবে পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট পুকুরে ব্যবহার করতে হবে।
- অনেক সময় মৃগেল মাছের পোনার গায়ে সাদা ফুটকি বা দাগ দেখা দেয়। এই অবস্থায় পোনাকে কেবল অন্য পুকুরে স্থানান্তর করলেই ভালো ফল পাওয়া যায়।

জলমহাল ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের মোট উৎপাদিত মাছের বিরাট অংশ আসে বদ্ধ ও উন্মুক্ত জলমহাল থেকে। দীর্ঘদিন যাবৎ অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলমহালগুলো ইজারা প্রথার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে ইজারাদারগণ শুধুমাত্র মাছই আহরণ করে থাকে, জলমহালগুলোর বা মাছের কোন ব্যবস্থাপনা করে না। বরং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ইজারা দেয়া হয় বিধায় উক্ত জলমহাল থেকে ইজারাদারগণ সর্বোচ্চ পরিমাণ মাছ আহরণের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকে। তা'ছাড়া ইজারাদারগণ মৎস্য সংরক্ষণ আইনকে তোয়াক্কা না করে মৎস্য আইন ভঙ্গ করে থাকে এমনকি প্রায়শঃই বিল শুকিয়েও মাছ আহরণ করে থাকে। ফলে বদ্ধ প্রাকৃতিক জলাশয়গুলোতে মাছের উৎপাদন দিন দিন কমে যাচ্ছে। অপরিকল্পিত সেচ অবকাঠামো ও পলি পড়ে জলমহালগুলি ভরাট হয়ে যাচ্ছে এবং স্বার্থান্বেষী লোকজন অবৈধভাবে ধানচাষের নিমিত্ত সরকারী জমি আত্মসাৎ করে যাচ্ছে এবং বিলগুলোর আয়তন সংকোচন হচ্ছে। প্রাকৃতিক মাছের আধার এসব জলাশয়গুলো প্রকৃত জৈবিক ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য উপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। বদ্ধ জলমহালগুলো সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলো গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবেঃ

১. পরিকল্পনা প্রণয়ন

মৎস্যজীবীগণকে তাদের ইজারাকৃত বিলে অধিক উৎপাদনের জন্য বাস্তব বিষয়গুলো বিবেচনা রেখে সকলের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। পরিকল্পনার অংশ হিসাবে বিলের উন্নয়নের জন্য বা ব্যবস্থাপনার জন্য কী কী পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন, বিল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কত টাকা প্রয়োজন হবে, অর্থ সংগ্রহের পদ্ধতি কী হবে, কিভাবে টাকা ব্যাংকে জমা হবে এবং সবার কাছে গ্রহণযোগ্য কোন ব্যক্তি এই টাকার ব্যাংক একাউন্টের দায়িত্ব নিবে, হিসাব নিকাশের স্বচ্ছতা, দক্ষ ব্যবস্থাপনা, লভ্যাংশ বন্টন পদ্ধতি, জনমত প্রকাশের ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে। এছাড়া নারীর অধিকার বাস্তবায়ন ও ক্ষমতায়ন, জেন্ডার বৈষম্য হ্রাস, পরিবারের সদস্যদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করার বিষয়টি পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ।

২. বিল নার্সারি স্থাপন

প্রাকৃতিক জলাশয়ে মাছের ঘাটতি পূরণের নিমিত্ত বিলে বা বিলের অংশে বা বিলের পার্শ্ববতী এলাকায় মাছের নার্সারি স্থাপন করে পোনা অবমুক্ত করা একটি প্রকৃষ্ট উপায়। বিল নার্সারিতে উৎপন্ন পোনা জলমহালে অবমুক্ত করতে হবে। বিল নার্সারি স্থাপন করা হলো বর্ষাকালে প্লাবিত হওয়ায় পোনাগুলো বিলের মধ্যে আপনা আপনি ছড়িয়ে পড়বে, বড় হবে ও উপযোগী পরিবেশ পেলে বংশ বৃদ্ধি করবে। ফলে জলমহালের সামগ্রিক মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

৩. জলমহালে পোনা অবমুক্তি কার্যক্রম

পরিবেশগত বিবর্তন এবং মনুষ্য সৃষ্ট নানা প্রতিবন্ধকতার কারনে জলমহালগুলো বিগত বছরগুলোতে মাছের গড় প্রবৃদ্ধি ক্রমহ্রাসমান। অথচ এক সময় দেশের মোট মাছের উৎপাদনের অধিকাংশ উৎপাদন আসতো এ সকল জলাশয় হতে। জলমহালের প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরনের মাধ্যমে এ সম্পদকে সঠিক ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা গেলে জলমহালগুলোতে মাছের উৎপাদন প্রবৃদ্ধি বহুলাংশে বাড়ানো সম্ভব হবে। সেজন্য জলমহালে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে পোনা মাছ অবমুক্তি কার্যক্রম নিতে হবে। আর এজন্যই গুনগত মানের এবং কাংক্ষিত আকারের পোনা মাছ কম খরচে জলমহালে অবমুক্তির লক্ষ্যে সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সংশি্ষ্ট বিল নার্সারিতে পোনা মাছ উৎপাদন করাই শ্রেয়।

৪. বিল ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন

জলমহাল নীতিমালা ২০০৯ অনুযায়ী 'জাল যার জলা তার' ভিত্তিতে সমাজ সেবা বা সমবায় অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধিত সমিতির মাধ্যমে ২০ একরের উর্ধ্বে জলমহালগুলো জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি স্বল্প মেয়াদী বা দীর্ঘ মেয়াদী ইজারা দিয়ে থাকে। মৎস্যজীবী সমিতির সদস্য সংখ্য ২০ থেকে কয়েকশ হতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক সদস্যই সমান ভাবে সময় দিতে পারে না এবং সকলেই এবিষয়ে সচেতন থাকেন না। তাই প্রশাসনিক যোগাযোগসহ জলমহাল ব্যবস্থাপনা সুচারুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে দক্ষ, সচেতন, শিক্ষিত ও সৎ ইত্যাদি গুণাগুনের ওপর নির্ভর করে মৎস্যজীবি সমিতির সকল সদস্যদের উপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে একটি বিল ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা যেতে পারে। এই কমিটির সদস্য সংখ্যা কতজন হবে তাও সমিতির সদস্যগণ নির্ধারণ করবেন। ইজারাকৃত জলমহালের ব্যবস্থাপনায় এখনও জৈবিক ব্যবস্থাপনাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না্ই এবং জৈবিক ব্যবস্থাপনাকে গুরুত্ব দেয়াও হয় না। জলমহালগুলোতে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করতে হলে প্রতিটি ইজারাকৃত জলমহালে সমাজভিত্তিক জলমহাল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। ইজারা দেয়া জলমহালে মাছের বংশবৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র রক্ষার নিমিত্ত মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নের নিশ্চয়তাসহ জলমহালে পোনা মাছ অবমুক্তি, প্রতিটি জলমহালে মাছের অভয়াশ্রম স্থাপন বাধ্যতামূলক ও প্রয়োজনমাফিক মাছের আবাসস্থল উন্নয়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. মৎস্যজীবী সদস্যদের পর্যায়ক্রমে জলমহাল পাহাড়া দেয়া

বাংলাদেশের জলাশয়সমূহে মাছ চাষের অনেক সমস্যার মধ্যে একটি বড় সমস্য হলো মাছ চুরি বা প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে নানা ধরনের ক্ষতি করা। তাছাড়া মৎস্যজীবী সদস্যদের মধ্যেও অনেকই অসচেতন ও অজ্ঞ থাকে বিধায় তারাও

বৃহত্তর স্বার্থ ব্যতিরেকে ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থ অর্জনের জন্য অবৈধ জাল দিয়ে মাছ আহরণ করে থাকে। ফলে, সমিতির সদস্যদের মধ্যে দ্বন্ধ দেখা দেয়। অনেক প্রভাবশালী লোক জলমহালের চতুর্পার্শ্বে থাকে এবং তাদের নানাপ্রকার ইন্ধনে অনেক মৎস্যজীবীই অবৈধভাবে জলমহালে নির্বিচারে মাছ আহরণ করে থাকে। তাই জলমহাল হতে অবৈধভাবে মাছ আহরণর বন্ধ করার নিমিত্ত মৎস্যজীবী সদস্যসের নিয়ে গঠিত বিল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে পাহাড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। বিল ব্যবস্থাপনা কমিটি পর্যায়ক্রমে বিল পাহাড়ার ব্যবস্থা করার জন্য মৎস্যজীবী সদস্যগণকে নির্ধারণ করে দায়িত্ব প্রদান করবে।

৬. মৎস্য সংরক্ষণ আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া

মৎস্য সম্পদের গুর ত্ব বা সম্পদের বর্তমান ও ভবিষ্যত চাহিদা, প্রাপ্যতা এবং যথাযথ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের বিষয়টি বিবেচনা করে সরকার কতিপয় আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করেছেন। দেশব্যাপি মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে কর্মীবৃন্দ মৎস্য বিষয়ক আইন ও বিধিমালা সম্পর্কে বিভিন্ন ভাবে গণসচেতনতা সৃষ্টিতে এবং সেগুলোর যথাযথ প্রয়োগে মৎস্যজীবীগণকে পরামর্শ প্রদান করবে। মৎন্যজীবীগণও এ সকর আইন বাস্ড়বায়ন মেনে চলবে ও প্রয়োজণীয় সহায়তা প্রদান করবে। মৎস্য সংরক্ষণ আইন ও বিধিমালা বাস্ড়বায়ন করা হলে মৎস্যজীবীগণই এ সুফল ভোগ করবে। জলমহালগুলোতে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে মৎস্যজীবীগণের আয় বৃদ্ধি পেয়ে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে-এ বিষয়ে মৎস্যজীবীগণকে ভালভাবে বুঝাতে হবে। মৎস্যজীবীগণও এ সমস্ড় আইন বাস্ড়বায়নে আইনের প্রতি শ্রদ্বাশীল হয়ে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

৭. সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত জাল বা অন্যান্য পন্থায় মাছ আহরণ থেকে বিরত থাকা

জলমহালে ক্ষতিকারক জাল বা বিভিন্ন অবৈধ পদ্ধতি দ্বারা মাছ ধরা বর্তমানে একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ও বহুল প্রচলিত। প্রধান ক্ষতিকারক জালের মধ্যে কারেন্ট জাল, পাটা জাল ও বেড় জাল (মশারী) উলে খ যোগ্য। কারেন্ট জাল, ফাঁস জালের মতই মনোফিলামেন্ট দ্বারা তৈরি জাল যা মাছের দৃষ্টি এড়িয়ে জলাশয়ে চলাচলকারী ছোট বড় সকল মাছকে ফাঁসে আটকাতে পারে। বেড় জাল যা মশারীর চেয়েও ঘন নাইলন কাপড় দিয়ে তৈরি এবং এ জাল রেণু পোনাসহ সকল মাছকে ধরতে পারে এবং ধৃত মাছের বেশির ভাগই পোনা বা কিশোর শ্রেণির। এসব অবৈধ জালের মাধ্যমে ছোট বড় সকল প্রকার মাছ ও পোনা মাছ ধরে ফেলাই প্রাকৃতিক জলাশয়ে মাছের উৎপাদন ক্রমশ হ্রাস পাওয়ার মুল কারণ। তাই মৎস্যজীবীগণকে স্বপ্রনোদিত হয়ে নিজেদের স্বার্থে এ সকল অবৈধ জালের ব্যবহার সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ করতে হবে।

৮. সমিতির সদস্যদের কমপক্ষে পাক্ষিক ভিত্তিতে নিয়মিত সভা করা

একতা দূর্বলকে সবল করে। ঐক্যের মাধ্যমে গরিব ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষ সকল বাধা বিপত্তি ডিঙ্গিয়ে ঘটাতে পারে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। এর সঙ্গে সঠিক নেতৃত্ব যোগ হলে অগ্রযাত্রা আরো বেগবান হয় এবং উন্নয়নের শাখা-প্রশাখা বিস্ড়ার করে। কিন্তু মৎস্যজীবীগণের মধ্যে ঐক্যের অভাব ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে এমনকি তারা অন্যের কথার সত্যতা যাচাই না করে বিশ্বাস করে থাকে। ফলে সমিতির সদস্যদের মদ্যে বিরোধ ও ভুল বুঝাবুঝির উপক্রম হয় এবং ফলে নিজেদের মধ্যে দ্বন্ধের সৃষ্টি হয়। তাই এ ধরনের সমস্যা সমাধানের নিমিত্তে প্রতি মাসে অন্ড়তঃ দুবার বা নিয়মিত সভা করতে হবে এবং সভায় অত্যন্ড় জর“রী বিষয়গুলি চিহ্নিত করে আলোচনার মাধ্যমে সকলে সিদ্ধান্ড়গ্রহণ করে বাস্ড়বায়ন করতে হবে।

৯. জলমহাল সংলগ্ন কমিউনিটি সেন্টার তৈরি

প্রতিটি জলমহালের চতুর্পার্শ্বের মৎস্যজীবীদের নিয়ে একটি সমিতি হয়ে থাকে তাই সকলের কথা বিবেচনা রেখে জলমহালের সুবিধাজনক স্থানে একটি ঘর তৈরি করা যেতে পারে যাকে কেন্দ্র করেই বিল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ ও অন্যান্য সদস্যগণ প্রতিদিন তাদের সুবিধামত সময়ে একত্রিত হয়ে মত বিনিময় করতে পারে। তা'ছাড়া মাঝে মাঝে পাক্ষিক বা অন্যান্য সভাও এখানে সম্পন্ন করতে পারবে। উক্ত কেন্দ্রটি প্রশিক্ষণ কক্ষ, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানসহ পাহাড়া দেওয়ার কাজে আশ্রয় ঘর হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। তা'ছাড়া উক্ত কেন্দ্রটি সমিতির অফিস হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে এবং হিসাব নিকাশের জন্য যাবতীয় রেজিষ্ট্রার সমূহ এখানে সংরক্ষণ করতে পারবে।

১০. জলমহালের গভীর অংশে স্থায়ী অভয়াশ্রাম স্থাপন

মৎস্য অভয়াশ্রমে ছোট বড় এবং মা-বাবা মাছ নিরাপদে আশ্রয় নেয়, বড় হয় এবং প্রজনন মৌসুমে তাদের সুবিধাজনক স্থানে প্রজনন করে। জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, সর্বোপরি মাছের সামগ্রিক উৎপাদন বাড়ানোর এটা অত্যন্ড় ফলপ্রসু উপায়। জলাভুমির কোন নির্দিষ্ট উপযোগী এলাকাকে অভয়াশ্রম হিসেবে নির্বাচন করে এবং ঘোষণা করে তা বাস্ড়বায়ন করতে হবে। বিভিন্ন প্রজাতির মাছের জন্য বিভিন্ন আবাসস্থলে অভয়াশ্রাম প্রয়োজন। যেমন-কৈ, শিং, মাগুর, টাকি ইত্যাদি মাছের জন্য বিল বা প□াবনভূমিতে অভয়াশ্রম স্থাপন করতে হবে। আবার র“ইজাতীয় মাছ ও বড় আকারের ক্যাটফিসের জন্য নদী ও অন্যান্য জলমহালে মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন করতে হবে। অভয়াশ্রম স্থাপনের স্থান নির্বাচন, মাছের নিরাপত্তা, প□াবনভূমির ও জলাভূমির পলি ভরাট ইত্যাদি বিশেষ বিবেচনায় আনতে হবে। অভয়াশ্রমের প্রভাবে মুক্ত জলাশয়ে বিলুপ্ত প্রায় মাছের পুনরাবির্ভাব ঘটে, মাছের প্রাচুর্য ও বৈচিত্র বৃদ্ধি পাবে এবং সামগ্রিক মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় দরিদ্র জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হবে। পাশাপাশি মাছের এ প্রাচুর্যের প্রভাবে জলাশয় এলাকায় অন্যান্য জলচর প্রাণি বৃদ্ধি পায় ও পাখি কুলের সমাগম ঘটতে শুর“ করে।

১১. মৎস্য আবাসস্থল পুনরুদ্ধার ও উন্নয়ন

জলাভুমিতে পলি ভরাট, আন্তঃ বিভাগীয় সমন্বয়হীন বেড়িবাঁধ ও রাস্তাঘাট নির্মানের ফলে মাছের খাদ্য ও প্রজননের জন্য মাছের চলাচল পথ বন্ধ হওয়ায় মাছের আবাস ভুমির অবক্ষয় হয়েছে। ফলে মাছের বিচরণ ও প্রজনন ব্যাহত হয়। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মাছের বিচরণ ও প্রজনন ক্ষেত্র রক্ষাকল্পে জলাশয় পুনঃখনন ও মূল উৎসের সাথে সংযোগ স্থাপন করা অতীব জরুরী।

১২. সুফলভোগীদের সঞ্চয় হিসাব খোলা

সমবায় ভিত্তিক সংগঠনের মূলধনের প্রধান উৎস হচ্ছে সদস্যগনের মাসিক চাঁদা। তাই মাসিক চাঁদা রশিদের মাধ্যমে গ্রহণ করে সঞ্চয়ী হিসাবে জমা রাখতে হবে। সঞ্চয়ী হিসাব যাদের নামে খোলা হবে তাদেরকে অবশ্যই স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। এই সঞ্চয়ী হিসাব হতে টাকা উত্তোলন করে তারা আয়বর্ধনমূলক যে কোন কাজ সম্পাদন করতে পারবে এবং যখন মাছ আহরণ বন্ধ থাকবে তখন সদস্যদের অতি প্রয়োজনীয় কাজে সঞ্চয়কৃত টাকা ব্যবহার করতে পারবে।

১৩. জলমাহল ব্যবস্থাপনায় নারীর অংশ গ্রহণ

ক্ষুদ্র জলাশয় ব্যবস্থাপনার পুরুষের পাশাপাশি নারীরা জলমহাল ব্যবস্থাপনা যেমনঃ জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, মাছ ধরার চাপ কমানো এবং লাগসই ব্যবস্থাপনায় উলেখযোগ্য ভূমিকা রাখিতে পারে। অভয়াশ্রম স্থাপন ও ডিমওয়ালা মাছ সংরক্ষন, কারেন্ট জাল ব্যবহার থেকে বিরত থাকায় বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে ও মৎস্যজীবীগণকে বিরত করতে নারীগণ বিশেষ ভুমিকা রাখতে পারে। জলাশয় সংলগ্ন আবাদি জমিতে কীটনাশক ব্যবহারের কুফল এবং মৎস্য আইন মেনে চলতে পুরুষদের উদ্বুদ্ধ করে নারীরা কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে।

১৪. নির্দিষ্ট মৌসুমে নির্দিষ্ট জাল দ্বারা মাছ আহরণ এবং লভ্যাংশ সমহারে বন্টন

মাছের আকার বড় হলে বা জলাশয়ের পানি কমে যাওয়ার সময় বিল ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং সকল সদস্যদের উপস্থিতিতে সভার মাধ্যমে যে সকল জাল দ্বারা মাছ আহরণ করা হবে তা চিহ্নিত করতে হবে। অতঃপর বিচ্ছিন্ন ভাবে মাছ আহরণের পরিবর্তে সকলের সমন্বয়ে মাছ আহরণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং আহরণকৃত মাছের বিক্রয়লব্ধ টাকা ব্যাংক হিসাবে জমা করতে হবে। সঞ্চিত অর্থ পরবর্তীতে সকল সদস্যদের মধ্যে সমহারে বন্টন করতে হবে।

১৫. পর্যালোচনা ও ভবিষ্যৎ করণীয়

যে কোন কর্মকান্ডের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পর্যালোচনার ও মূল্যায়ণের মাধ্যমে একটি কাজের ভুল ত্রুটিগুলি সনাক্ত করা যায়। কাংক্ষিত সফলতা অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ সমূহ উদঘাটন করে

সঠিক কার্যব্যবস্থা নেওয়া যায়। তাই যে কোন কাজ শেষে পর্যালোচনা একটি অত্যন্ড় গুর ত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। যদিও শেষ কথা বলে কিছু নেই তবুও বলা যায় বিলে মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনায় সমবায় ভিত্তিক উদ্যোগের বা সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনার কোন বিকল্প নেই। সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় বিল পাড়ের মানুষদের অংশিদারিত্বের স্বীকৃতি মেলে, লাভবান হয় বেশি মানুষ, উপকৃত হয় জাতি এবং এগিয়ে যায় দেশ।

বিল হতে মৎস্য আহরণ, পরিবহন ও বিপণন পদ্ধতি

মৎস্য আহরণ

প্রাকৃতিক উৎস হতে মৎস্যজীবীগণ সাধারণত মাছ ধরার মৌসুমে বিচ্ছিন্ন ভাবে মাছ আহরণ করে থাকে যার দর ন সকল মৎস্যজীবীগণ সম পরিমাণ মাছ আহরণ করতে পারে না। মৎস্য আহরণের পরিমাণের বৈষ্যমতার ফলে

মৎস্যজীবীদের মধ্যে পারস্পারিক সংঘাত ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং এর প্রভাবে মৎস্যজীবীদের সমিতি সার্বিক কার্যক্রম গ্রহণে বাধাগ্রস্থ হয়ে থাকে। তা'ছাড়া একসাথে মাছ আহরণ না করলে অধিক আহরণের চেষ্টায় এবং ব্যক্তিগত স্বার্থে ছোট আকারের মাছগুলোও আহরণ করে ফেলে যা বিলের সার্বিক উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটে। তাই মৎস্যজীবীদেরকে একত্রে কয়েকটি জাল দ্বারা মাছ আহরণ করে বিক্রয় করতে হবে এবং তা সমিতির হিসাবে প্রথমে জমা দিয়ে সেখান থেকে অংশদারিত্বের ভিত্তিতে বা সমহারে লভ্যাংশ বন্টন করে নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

মৎস্য পরিবহন

মাছ দ্রুত পচনশীল একটি পণ্য। মৎস্যজীবীগণকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে মাছের পেশী যেন বিক্রয়ের পূর্ব পর্যন্ড় সতেজ থাকে। মাছ আহরণের পর থেকে বাজারজাতকরনের মধ্যবর্তী সময় যত দেরি হবে মাছের পচনও তত বেশি হবে। এই পচন রোধকল্পে আহরণকৃত মাছ আকারের ওপর ভিত্তি করে গ্রেডিং করে ও ভালভাবে পরিস্কার করে স্বাস্থ্যসম্মত পানিতে উৎপাদিত বরফ দিয়ে মাছ প্রক্রিয়াজাত করতে হবে। নতুবা মাছের টাটকা অবস্থা থাকবে না, ফলে মৎস্যজীবীদেরকে কম দামে মাছ বিক্রয় করতে হবে। মাছ পরিবহনের জন্য ইনসুলেটর ভ্যান ব্যবহার করতে পারলে ভালো। তা'ছাড়া বড় মাছ বাজারজাতকরণে মাছের নাড়িভঁড়ি ফেলে দিয়ে স্বাস্থ্যসম্মত পানি দিয়ে পরিস্কার করে প্লাষ্টিক বাক্সে করে পরিবহন করলে মাছের গুণগতমান ভালো থাকবে।

[

মৎস্য বাজারজাতকরণ

বাজারজাতকরণ হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠি অন্যের জন্য পণ্য তৈরি বা উৎপাদন করে এবং তাদের মধ্যে পণ্য বিনিময় করে নিজেদের প্রয়োজনীয় পণ্য পেয়ে থাকে যা দিয়ে তাদের চাহিদা ও অভাব পুরণ করে থাকে। মৎস্যজীবীগণ তাদের জলমহাল হতে আহরণকৃত মাছ বাজারে বিক্রয় করে তাদের জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলো পুরণ করে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মৎস্যজীবীগণ জলমহাল হতে মাছ আহরণ করে আহরণস্থলেই পাইকারের নিকট বিক্রয় করে থাকে। ফলে মাছের প্রকৃত মূল্য থেকে তারা বঞ্চিত হয়। সেজন্য মৎস্যজীবীগণকে সচেতন হতে হবে এবং মাছ আহরণ করার পূর্বেই কোন স্থানে বিক্রয় করলে উপযুক্ত মূল্য পাওয়া যাবে সে বিষয়ে খোঁজ নিয়ে রাখতে হবে। অতঃপর নিজেরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে আহরণকৃত মাছ সংশিষ্ট স্থানে পরিবহন করে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাতেই তারা আহরণকৃত মাছের প্রকৃত মূল্য পাবে।